An ISO 9001 : 2008 certified Company

With Best
Compliments From :-

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED
FOR ANY TYPE OF PILE FOUNDATION WORK

CAST-IN-SITU DRIVEN, CAST-IN-SITU BORED, PRECAST DRIVEN, PRECAST PRE-BOARD, STEEL OR R.C.C. SHEET PILES ETC

AND

ALL TYPES OF ENGINEERING AND CONSTRUCTION WORKS FOR CIVIL, STRUCTURAL, MARINE, TANKAGES, PIPING EQUIPMENT ERECTION IN

Power Station, Road Projects, Fertilizer Projects, Cement Plants, Refinery Construction, Coal Handling Plants,Paper Mills, R.C.C. or Prestressed Concrete Bridges, Fabrication & Erection of Steel Structures, Hydrocarbon Storage Tanks and Pipeline, Cross-Country Pipeline, Steel Plant Construction, Multi-storied Building, Micro-Tunneling, Box/Pipe Pushing, HDD, High-rise Silo Structures By Slipform Technique,Bunkers, Jetties, Marine Structures, Deep Underground Basement, Textile factories, Effluent Treatment Plant, Water & Sewage Treatment Plant Etc., as Well as Turnkey Construction And for any other type of Industrial and Utility Projects For Economy, Speed and Quality Construction.

CONTACT :

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

Foundation, Reinforced & Prestressed Concrete Specialist

REGD. OFFICE
"Simplex House"
27, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700017
Phone :- (033) 2301 1600
Fax :- (033)2283 5964/65/66
E-mail :- simplexkolkata@simplexinfra.com
Web :- www.simplexinfrastructures.com

ADM. OFFICE
12/1, Nellie Sengupta Sarani
Kolkata – 700087
Phone :- (033)2252 8371/8373/8374
Fax :- (033) 2252 7595

BRANCHES

NEW DELHI **MUMBAI** **CHENNAI**

উপন্যাস

চিরন্তন কাহিনি

সুমিত্রা ঘোষ

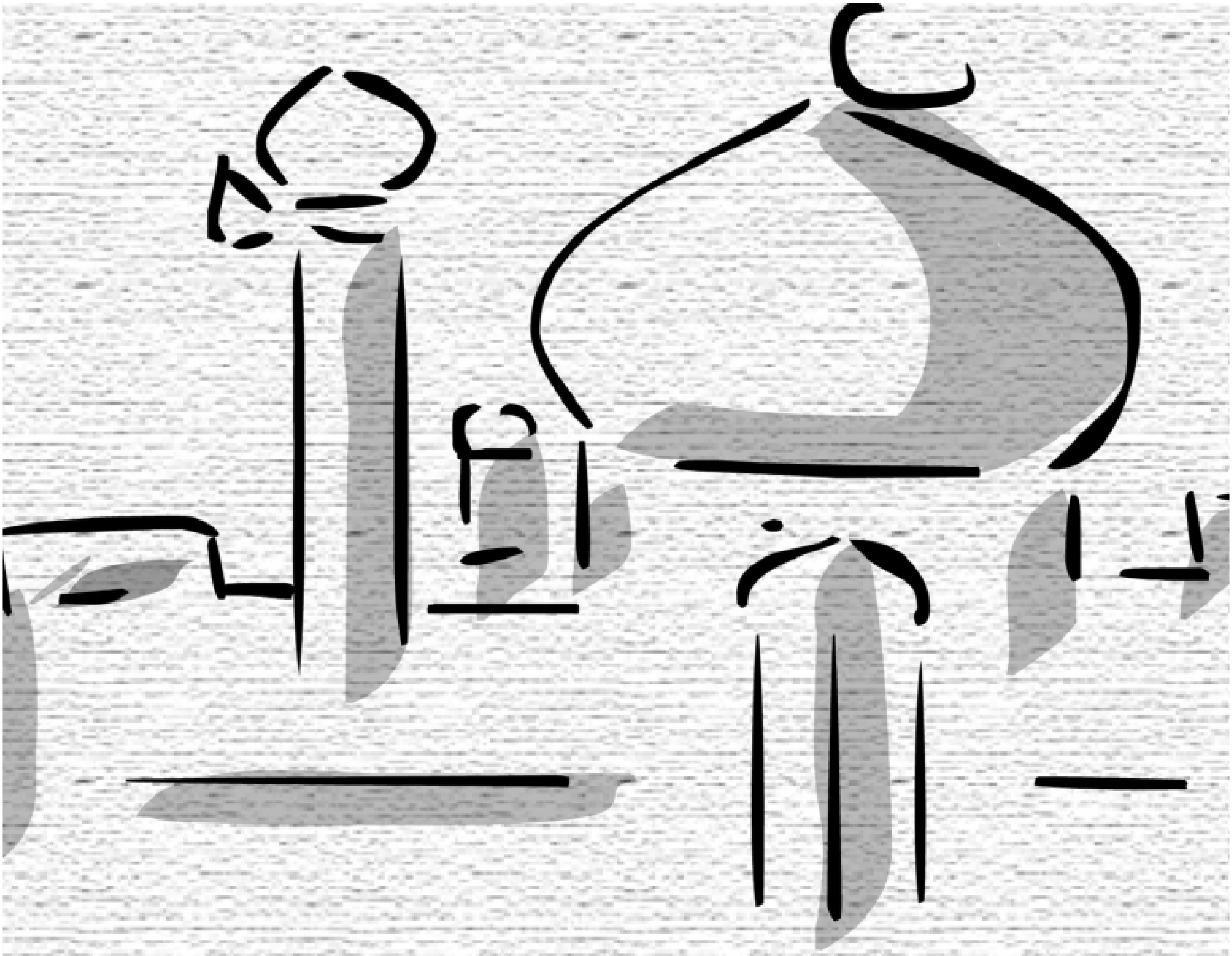

শর্মির হাতে এখন অখণ্ড সময়। মাত্র ছ'মাস আগেও ভাবনার জগৎ দরজায় কড়া নাড়েনি কখনও। শর্মি নিজেই ওকে আহ্বান করেনি, কারণ তখন ওর জীবন-নদী এক অন্য খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। অতীত-ভবিষ্যৎ নিয়ে বসে বসে ভাববার অবকাশ ছিল না। প্রত্যেকদিন, প্রত্যেক আনন্দময় মুহূর্ত ওর প্রতিদিনের বর্তমানকে প্রাধান্য দিত। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির বন্ধুরা ছিল ওর সখা-সখি, সুখের-দুঃখের সহচর। তেমন কোনো দুঃখও ছিল না ওর। ঐ, দেরি করে ফেরার জন্য কিংবা যখন তখন বন্ধুদের ফোনকল পেয়েই বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে মা-র সঙ্গে একটু তর্কাতর্কি কিছুক্ষণের জন্য দুঃখ-দুঃখ ভাব সৃষ্টি করত মাত্র। গড়িয়াহাটের মোড়ে, কখনও নন্দনে গাছের গোড়ায় বাঁধানো বেদীতে নয়ত দক্ষিণ কোলকাতার কোনো কফিশপে বিকেলের আড্ডায় পৌঁছে গেলেই ওর মনের মেঘ কেটে যেত। মোট কথা বন্ধুদের সাহচর্য আর দক্ষিণ কোলকাতার মোহ ওকে যেন চিটেগুড়ে মুখ থুবড়ে পড়া মাছির মতো আবিষ্ট করে রেখেছিল। দক্ষিণ কোলকাতা ছেড়ে উত্তর কোলকাতা তো নয়ই, সল্টলেকে থাকতে বললেও রাজি হতো না হয়ত। সেই শর্মিষ্ঠা এখন লক্ষ্ণৌ শহরে বরের সরকারি কোয়ার্টারে খাঁচাবন্দি পাখি। আর আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই বন্দিদশা ও দিব্যি মেনে নিয়েছে। অথচ অর্জুনের সঙ্গে বিয়ে পাকা হবার পর কত না ধানাই-পানাই করেছে মা-বাপির সঙ্গে— তোমরা কোলকাতায় কাউকে খুঁজে পেলে না আমার জন্য?

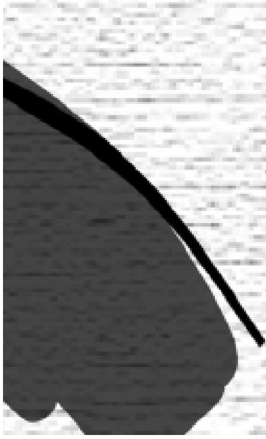

মা যথারীতি বাঁকা সুরে বলেছিল— না, পেলাম না। তুমি নিজে যখন সারাজীবন ধরে তোমাকে কোলকাতায় রাখবে এমন কাউকে পছন্দ করে আনতে পারোনি, তখন আমরা সম্বন্ধ করে দেখেশুনে যে পাত্রকে উপযুক্ত মনে করব, তার সঙ্গেই বিয়ে হবে।

শর্মিও গলা চড়িয়ে উত্তর দিয়েছিল— তোমাদের উপযুক্ত আই পি এস অফিসারের তো দিনরাত বলে কিছুই থাকবে না। লক্ষ্ণৌয়ের মতো নির্বান্ধব পুরীতে সারাদিন ঘরে একা একা থেকে আমার তো দমবন্ধ হয়ে যাবে। পাগল হয়ে যাবো আমি।

রুবিও তীক্ষ্ণ উত্তর দেয়— পাগল হবে না, তবে ঘরে থাকার অভ্যেসটা হবে। বাপের অতিরিক্ত আদরে-প্রশয়ে যখন-তখন টইটই করে বাইরে উড়নচণ্ডীর মতো ঘুরে বেড়ানোটা বন্ধ হবে। দয়া করে এখন কিছুদিন ঘরে থেকে ঘরকন্না করা শেখো। কাজে লাগবে।

ঝড়-তুফানের সংকেত পেয়ে দিব্যেন্দু তাড়াতাড়ি নৌকোর হাল ধরে— আরে বাবা, তুই অকারণ ভয় পাচ্ছিস। অর্জুন হাসিখুশি মিশুকে ছেলে। ও তো নিজেই একা থাকে, একা থাকার অসুবিধা ও বুঝবে না। তোকে সঙ্গী পেলে দেখবি ও হাজারবার ফোন করবে। একটু সময় পেলেই বাড়িমুখো গাড়ি ঘোরাবে। সেদিন সন্ধের সময় যে তোদের দুজনকে একসঙ্গে পাঠানো হলো পরিচিত হবার জন্য সেদিন একেবারে ডিনার করে ফিরেছিলি! তোর কি খারাপ লেগেছিল ওকে? মোস্ট আন-রোমান্টিক বলে মনে হয়েছিল? বল?

— না বাপি খারাপ লাগেনি, ভালই লেগেছে। রোমান্টিক কথাবার্তা প্রথম পরিচয়েই বলেনি বলেই ভাল লেগেছে, নাহলে ছ্যাবলা কার্ত্তিক মনে হতো। ওর পারসোনালিটি আছে, ম্যাচিওর্ড মানুষ। আমার সব ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করার মতো ওর কতখানি ক্রাইটেরিয়া আছে সেটা তো একসঙ্গে না থাকা অব্দি বোঝা যাবে না। মা আমাকে যাই বলুক, আমারও পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে। একসঙ্গে থাকতে গেলে দুজনকেই কিছু অ্যাডজাস্ট, কিছু কমপ্রোমাইজ করতে হয় এইটুকু জ্ঞান আমার আছে। ... আসলে তোমাদের ছেড়ে, চেনা পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে অতো দূরে চলে যেতে হবে একথা কখনও ভাবিনি তো, তাই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। ওখানে একটা আত্মীয় স্বজনও নেই আমাদের, যাদের কাছে যেতে পারি। তোমাদের কথা সারাক্ষণ মনে পড়বে, তোমাদের দেখবার জন্য ছটফট করব, কিন্তু চলে আসতে পারব না। এখানে হলে যখন-তখন এসে দেখে যেতাম।

রুবির কান্না এসে পড়েছিল, কষ্ট করে কান্নাটাকে চোখের পেছনে ঠেলে দেয়। নিজের মেয়েকে ও জানে, বাপি-মা অন্ত প্রাণ। মা-বাবা ওর প্রথম বন্ধু, তারপর অন্য বন্ধুরা যারা ওর স্কুল-কলেজের সাথী, একেবারে প্রাণের কাছাকাছি। মালদার মেয়ে রুবিকেও চেনা জগৎ ছেড়ে বৌ হয়ে কোলকাতায় আসতে হয়েছিল। ওরও কষ্ট হয়েছে। কিন্তু জীবনের ধর্মকে অস্বীকার অনাদর করা যায় না। তাহলে তো জীবন থেমে যাবে, অচল পাথরের মতো। বিশেষ করে অ্যারেঞ্জড্ ম্যারেজে একটা ভয় থাকেই। একেবারে অচেনা একজন পুরুষ আর তার পরিবারের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় লাগে। প্রতি পদে পদে সতর্ক থাকতে হয় যাতে ভুলত্রুটি না হয়ে যায়। নিজের মতামত প্রকাশ করার অধিকার প্রায় থাকেই না। রুবির ইচ্ছে ছিল শর্মি নিজে দেখেশুনে মনের মানুষটিকে নির্বাচন করুক। কিন্তু নিজের দলে যে কটা ছেলে আছে, তাদের কাউকে জীবনসাথী করার কথা মেয়ে কল্পনাও করতে পারে না। বলে— পাগল নাকি? ওরা আমার সমবয়সী ছেলে, সহপাঠী। ওদের সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ হয়, প্রেমটেম হয় না। অনেকে দেখি প্রেম করে, তবে আমার মনে হয় ওটা স্রেফ টাইম-পাস। আমাদের গ্রুপের পাঁচটা ছেলের মধ্যে চারজন বেকার। একজনই শুধু স্কুল সার্ভিস পরীক্ষা পাস করে মাস্টারি করে। ... আমি বাপু ওসবের মধ্যে নেই। রুবি বুঝতে পেরেছিল, ওর পাঁচফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা, ভাল স্বাস্থ্য, সুন্দর ফিগার, সুশ্রী মুখশ্রী মেয়ে টাইম-পাস প্রেমের গেমটাও খেলতে পারবে না। ওদিকে চাকরি করতেও অনিচ্ছুক। ও শুধু বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হৈহৈ করে আড্ডা মেরেই সন্তুষ্ট থাকতে চায়। তখনই ও মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি সুপাত্র খুঁজে দেওয়ার জন্য সব আত্মীয়-স্বজনকে অনুরোধ করেছিল। ভগবান কৃপা করেছিলেন। শর্মির জেঠুই সম্বন্ধ নিয়ে এলেন কৃষ্ণনগর থেকে। রুবির বড় জায়ের পিসতুতো বোনের ননদের ছেলে, আই পি এস অফিসার ছ'ফুট লম্বা। পাত্রপক্ষও পরিচিত দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের পরিধির মধ্যে উপযুক্ত লম্বা পাত্রী খুঁজছে। বড়দা একেবারে দিব্যেন্দুদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণনগরে এলেন। পাত্রপক্ষের শর্মিকে পছন্দ হয়ে গেল, শুধু পাত্র বাকি। সে এসে দেখে পছন্দ করলেই এই বিয়ে পাকা। অর্জুন চট্টোপাধ্যায়েরও শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়কে পছন্দ হয়ে গেল। বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হয়ে গেছে, এখন মেয়ে অতো দূরে যাওয়ার কথা চিন্তা করে মুষড়ে পড়ছে, ইচ্ছে হলেই এসে মা-বাবাকে দেখতে না পারার কষ্ট এখন থেকেই অনুভব করতে শুরু করে দিয়েছে। কল্পনাতীত সৌভাগ্য পেয়েও খুশিতে অহঙ্কারে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি মেয়ে। সে মা-বাবার জন্য চিন্তিত। রুবির চোখে জল আসাই তো স্বাভাবিক।

— তুই তো বললেই বলবি আদ্যিকালের বুড়িদের মতো

কথা বলছি। তবুও বলছি, আটানব্বই শতাংশ মেয়েকেই বাবা-মাকে ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়। আজকাল মেয়েরা এডুকেশন নিতে কিংবা বরের কর্মস্থল বিদেশে চলে যাচ্ছে। দু-তিন বছরে হয়তো একবার আসতে পারে। তুই এক রাত্তিরের জার্নি লক্ষ্ণৌতে যাবি। বছরে দু-একবার আসতে চাইলে বাধা দেবে না অর্জুন। তাই বলে যখন তখন বায়না করাও নির্বুদ্ধিতা হবে। ফোনে প্রত্যেকদিন আমাদের সঙ্গে, শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলবি। এখন আমাদের থেকেও ওদের জন্য তোকে ভাবতে হবে সবসময়। ওদের খুশি রাখার চেষ্টা করবি, একটু সেবা-যত্ন করবি, দেখবি কত সহজে তুই অর্জুনের মন জয় করে ফেলেছিস। সব ছেলেরাই কিন্তু মনে মনে চায় বৌ ওর বাবা-মাকে ভালবাসুক, তাহলে ছেলেটা নিশ্চিন্ত হয়ে খুশি মনে বাঁচতে পারে আর বৌকেও খুশি রাখার সবরকম চেষ্টা করে। দ্যাখ, সুখের সংসার আকাশ থেকে টুপ করে পড়ে না, নিজের চেষ্টায় তৈরি করতে হয়। সেজন্য হয়তো অনেক সময় তোর ইচ্ছে পূর্ণ নাও হতে পারে, এনিয়ে মন খারাপ করবি না। ওদের ইচ্ছেকে মর্যাদা দিবি। পরে দেখবি, তুই যা চেয়েছিলি, তার দশগুণ বেশি ওরাই তোকে না চাইতেই দেবে। ... শর্মি, শ্বশুর-শাশুড়িরা সবাই খারাপ এটা মিথ্যে কথা। রটনা মাত্র। অর্জুনের বাবা বিনা পণ, বিনা দাবিতে আই পি এস ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন ওরা কখনও খারাপ হতে পারেন না রে! তবে একটা কথা বলে রাখি শোন— প্রত্যেক শ্বশুর-শাশুড়ি মেয়ের জামাইয়ের মধ্যে ছেলেকে পেতে চায় আর ছেলের বৌয়ের মধ্যে মেয়েকে পেতে চায়। তোকে ওদের মেয়ে হতে হবে। দ্যাখ, তুই যখন আমার কথার অবাধ্যতা করিস তখন আমি তোকে বকাবকি করি তো? শাসন একটু আধটু করতেই হয়, নাহলে তো উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাবি! তুই কি আমার সঙ্গে পাঙ্গা নেবার জন্য ওসব মনে রাখিস? একটু পরেই তো মা-মা করে কাছে আসিস। শাশুড়িও মা। ওঁরও তোকে বকার, শাসন করার অধিকার আছে ভুলত্রুটি করলে। উনি বকলেন বলে তুইও দশটা কথা শুনিয়ে দিয়ে পাঞ্জা লড়তে গেলেই সম্পর্ক তেতো হতে আরম্ভ করবে। মনে রাখিস, তোর মাও তোকে অনেক বকেছে, তুই চুপচাপ সরে পড়তিস। সেটাই করতে হয়। তুই ডানাকাটা পরি নোস, ওরা ইচ্ছে করলে পরিও ধরে আনতে পারত। ওরা তোকে ভাল মেয়ে বলে পছন্দ করেছে রে! চিরকাল এই ভালমেয়ের মর্যাদাটা রক্ষা করিস মা! আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিস ওই বাড়িটাকে আপন করে নিয়ে। এটুকু করলে আমরাও খুশি হব। খুব ভাল থাকব। আমাদের চিন্তায় তোকে ছুটে ছুটে আসতেই হবে না।

রুবি শ্বাস নেবার জন্য থামতেই দিব্যেন্দু ফোড়ন কাটে— তোর মা ভাষণ দেবার সুযোগ পেলে মঞ্চ ছেড়ে নামতেই চায় না। আমি তোকে ফ্যাক্টগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি। এক নম্বর হলো তুই বাচ্চা মেয়ে নোস, পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে। কোন পরিস্থিতিতে মুখ বন্ধ থাকলে ঝামেলা এড়ানো যায় এটা খেয়াল রাখতে হবে। দু-নম্বর, আমি আর আমার বাবা-মা-পরিবারই শুধু ভাল, অন্য সবাই নিকৃষ্ট এই ভাবনাটা একেবারেই ভুল। এটা ত্যাগ করতে হবে। তিন নম্বর, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া, চেঁচামেচি এমনকি হাতাহাতি একেবারেই হয় না এমন দম্পতির সংখ্যা কম। এরকম পরিস্থিতিতে স্যুটকেস প্যাক করে বাপের বাড়ি চলে এলে হদ্দ বোকামি হবে। এক হাতে তালি বাজে না, দুজন না হলে ঝগড়া করা যায় না। তাই মাথা ঠাণ্ডা হলে নিজের দোষটা বোঝা যায়। একসঙ্গে থাকলেই মানভঞ্জন পালা গাইবার সুযোগ ঘটে রে, বাপের বাড়ি চলে এলে সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে বিপদ ডেকে আনে। দুটো মানুষ মিলে ঘর বাঁধবে সংসার সাজাবে আর কখনও ভুল বোঝাবুঝি হবে না এটা আবার হয় নাকি? পুতুলের সংসার তো নয় রে বাবা! দুটো জলজ্যান্ত মানুষের একসঙ্গে থাকা কি চারটিখানি কথা? মতের অমিল তর্কাতর্কি হবেই, ওগুলো কখনো সিরিয়াসলি নিবি না। যে যত মানিয়ে নিতে পারে সে ততো সুখে থাকে। দেখিস না বাজার থেকে আনা বেগুনের ভেতর পোকা থাকলে তোর মা যখন আমাকে আক্রমণ করে গজর গজর করে তখন আমি খবরের কাগজের আড়ালে আত্মগোপন করি? একটু পরেই সাদা সাদা ফুলকো লুচি আর পোকাকাটা জায়গা বাদ দিয়ে ভাজা বেগুন এনে সামনে রাখে— ব্যস্, মেঘ কেটে আকাশ পরিষ্কার! অন্য কার কি মতামত আমি জানি না, তবে আমার মতে সুখী সংসারের সংজ্ঞা হলো সহনশীলতা।

এতক্ষণ চুপ করে মা-বাবার কথা শুনছিল শর্মি। এবার মুখ খোলে— এটা একটু একপেশে হয়ে গেল না বাপি? মা অতো কাজের মধ্যে তোমার শার্টে বোতাম লাগাতে ভুলে গেলে তুমিও আক্রমণাত্মক গজর গজর করো। মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার চামড়া বাঁচিয়ে বোতাম সেলাই করে দেয়, একটাও কথা না বলে। আমি তোমাদের মেয়ে, তোমাদের দেখে দেখে কিছুটা তো শিখেছি। ভয় পেও না। তোমাদের বদনাম হতে পারে এমন কোনো কাজ আমি করব না। এতক্ষণ ঘুরিয়ে নাক দেখিয়ে আমায় বোঝাবার যে চেষ্টা দুজনে করলে সেটা আসলে তোমাদের মনের আতঙ্ক। আমার শুধু কোলকাতা ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ ছিল, অন্য কিছু নয়। জেঠুর হাতে ভাল রিপোর্ট কার্ড এসেছে বলেই জেঠু অর্জুন চ্যাটার্জীর সম্বন্ধটা এনেছে, নাহলে আনত না, এটুকু বিশ্বাস আমার আছে। আমি ওদের বাধ্য বৌ হয়েই থাকব, কথা দিচ্ছি তোমাদের। এবার একটু হাসো

তো। তোমাদের দুজনেরই মুখ শুকিয়ে আছে। কপালে এই ক'দিনেই চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। খারাপ কিছু হবে না। আমাকে কি দেখতে খারাপ বলো? পুলিশ পুত্রটি কি আর আমার সম্বন্ধে খোঁজ খবর না নিয়ে বিয়েতে রাজি হয়েছে? তাহলে ভয় পাচ্ছ কেন?

রুবির শুকনো মুখে সত্যিই হাসি ফোটে। বলে— আমি তোকে উড়নচণ্ডী বলেই ভাবতাম। তুই যে তলায় তলায় কখন পরিণতমনস্ক হয়ে গেলি টেরই পাইনি রে! আর বাবা-মার কাছে নিজের সন্তান সবচেয়ে সুন্দর বলে মনে হয়, তা না হলে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখে? তোর বন্ধুরা তোকে সুন্দর বলে, তাতে কি সন্দেহ আছে? দুধে আলতায় রং থাকলেই সবাই সুন্দর হয় না, ছিরি-ছাঁদ থাকা চাই। অর্জুন শ্যামবর্ণ, কিন্তু এক তিল বেশি শ্যাম। ওকে লোকে কালোই বলতে পারে। ওর কাটাছোলা ধারালো মুখশ্রী, ওর ফিগার ওকে সুপুরুষ করে তুলেছে। তাই না? তোর চেহারায়ও দারুণ গ্ল্যামার আছে, পছন্দ হবে না কেন? ঘটকালির বিয়েতে দু'পক্ষই খোঁজখবর নেয়, ওরাও নিশ্চয়ই নিয়েছে। নেবে না কেন? জানি, ঠাকুরের আশীর্বাদে সব কিছু মঙ্গলকর হবে, তবুও ভয় হয় রে শর্মি! সারা জীবনের ব্যাপার তো!

দিব্যেন্দু বলল— আমার ভয় কেটে গেছে। কারণ যার বিয়ে সে বোঝনদার হয়েছে যখন তখন আর ভয়ের কারণ নেই। শর্মি তো বলছে ও বদনাম হবার মতো কোনো কাজ করবে না। শাশুড়ির অবাধ্য হবে না— এইটুকুই তো যথেষ্ট। ভেবো না রুবি, তোমার মেয়ে খুব সুখে থাকবে, দেখে নিও।

এক লাফ মেরে বিছানা থেকে নামে শর্মি। ইস্ কখন যে বেলা পড়ে গেছে বুঝতেই পারেনি। দুপুরে বই পড়া, ঘুমনো এসব অভ্যাস ওর ছিল না। দুপুর দুটো নাগাদ অর্জুন একবার আসে লাঞ্চ করতে। ও চলে যাওয়ার পর সময় আর কাটে না একলা ঘরে। টিভি খুলে বসে থাকার মেয়ে ও নয়, অগত্যা বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে মন অটোম্যাটিক্যালি চলে যায় পেছনের পাতাগুলোয়। অনেক নতুন অভ্যাস ওকে তৈরি করতে হচ্ছে এখন। অলস দুপুর কাটানোর জন্য ফেলে আসা দিনগুলোতে ফিরে দেখাই শুধু নতুন নয়, জীবনে যা করেনি সেরকম অনেক কিছুই করতে হচ্ছে। এখানে আসার সময় শাশুড়ি-মা একটা লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি, পাথরের শিবলিঙ্গ, তামার ঘটি আর পাত্র দিয়ে বলেছিলেন— মাটিতে ছাড়া যে কোনো উঁচু জায়গায় এই তামার পাত্রে শিবকে বসিও। আর লক্ষ্মীনারায়ণকে পাশেই রেখো। যেখানে বসাবে এই লাল কাপড়ের টুকরোটা পেতে বসিও। প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা একটা প্রদীপ আর ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিও গা ধুয়ে কাচা কাপড় পরে। আর এই তামার ছোট ঘটটাতে একটু জল রেখে দিও। ওতেই হবে। বেশি কিছু করতে হবে না। শিবের মাথায় এই তামার ঘট থেকে জল ঢেলো, কেমন?

বাড়িতে বাপি মর্নিংওয়াক থেকে ফিরে স্নান করে রোজ পৈতেটাকে ধরে পুজো করত আর মা সন্ধেবেলা প্রদীপ-ধূপ জ্বালিয়ে শাঁখে ফুঁ দিত। ও কোনোদিন এসব করেনি। এখন রোজ করছে। আশ্চর্য, করতে খারাপ লাগছে না। শর্মি জামা-কাপড় নিয়ে তাড়াতাড়ি বাথরুমে গা ধুতে ঢুকে পড়ে। আর একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে, আজ বড় দেরি হয়ে গেল। এই টুকটাক কাজগুলো আছে বলে সময় একটু কাটে। রান্না ওকে করতে হয় না, অর্জুনের একজন কুক আছে। শশীদা মেদিনীপুরের লোক, ভালই রাঁধে। মা বলে বলে ওকে রান্না শেখাতে পারেনি, আর এখন নিজের তাগিদেই ও শশীদার কাছে আটপৌরে রান্নার তালিম নিচ্ছে। মাঝে মাঝে একপদ রান্না করেও ফেলছে। শর্মির ট্রাঞ্জিশন পিরিয়ডে এই নতুন জায়গায় বাঙালি শশীদা মস্ত সহায়ক। আর আছে ক্লিনার কাম কমবাইন্ড হ্যান্ড শিউশরণ। এখানে গোলপার্ক, গড়িয়াহাট, নন্দন নেই, আড্ডার মজাও পুরনো জাব্দা খাতায় চলে গেছে বটে। তবে লক্ষ্ণৌ কালীবাড়ির রাস্তাতে অর্জুনের আপন পিসির পরিবার শূন্য স্থান অনেকটাই পূর্ণ করে ফেলেছে ওদের সহৃদয় আন্তরিকতায়। বিশেষ করে পিসি শাশুড়ি নিজে। এই ছোট্ট বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে অর্জুন। সাড়ে ছ-মাসে অর্জুনকে ও অনেকটাই চিনেছে। একটু ফাঁক পেলেই ফোন করে বৌকে সঙ্গ দেবার চেষ্টা করে। একটু বেশি সময় অবসর পেলে সেই সময়টুকু নিজের অন্য কাজে ব্যয় না করে শর্মির জন্য খরচ করতে দ্বিধা নেই। ওর বৌ রোজ একবার কৃষ্ণনগরে ফোন করে বাবা-মার খবর নেয়, এতেই কৃতার্থ হয়ে আছে অর্জুন। বাপি বলেছিল— ভয় পেও না রুবি, ওরা দুজন খুব সুখী হবে দেখে নিও। এখন শর্মির মনে হয় ও সত্যিই সুখী। এই সুখী দাম্পত্যের জন্য নিজের মা-র অবদান কখনো অস্বীকার করতে পারবে না শর্মি। মা-র শেখানো পথে চলছে বলেই ও অর্জুনের কাছে অপরিহার্য। ভালবাসা, আদর, সোহাগ, সম্মান— কোনোকিছুরই কম রাখে না অর্জুন। শর্মি পরিপূর্ণ।

বিয়ের রাতে বরের বাড়ির আত্মীয়দের ভাল করে চেনা যায় না। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পরই প্রত্যেককে চেনবার মতো পরিচয় ঘটে। শর্মির ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। শুধু একজন মহিলা ওর চোখের লেন্সে আটকে পড়েছিলেন। বয়স্ক মহিলা লম্বায় ওর চেয়েও একটু বেশিই হবেন। পেটানো শরীরের কোথাও মেদের লেশমাত্র নেই, সাজে সজ্জায় আধুনিক, অত্যন্ত স্মার্ট। কৃষ্ণনগরের আদি বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে ওই বয়সী অন্য সব মহিলাদের থেকে একেবারে আলাদা। উনি বন্ধু-বান্ধব পরিবেষ্টিত শর্মির সামনে এসে বলেছিলেন— বাহ্! দাদা-বৌদির পছন্দ তারিফ লায়েক। খুব সুন্দর বৌ জোগাড় করেছে তো! আমি অর্জুনের আপন পিসি হচ্ছি। লক্ষ্ণৌতে আমার ঘর। ওখানে তোমার কোনো মুশকিল হবে না বেটা, আমরা সব সময় ধ্যান রাখব।

ওনার বাংলায় বলা কথার মধ্যে কয়েকটা হিন্দি শব্দ, অবাঙ্গালী টান শুনে বুঝেছিল ইনি দীর্ঘকাল প্রবাসী। অর্জুনের নিজের পিসি লক্ষ্ণৌতে থাকেন এটা জানা ছিল না। পিসি শাশুড়ি প্রথম দর্শনেই ভাল লেগে গেলেন। অষ্টমঙ্গলার পর অর্জুন লক্ষ্ণৌ ফিরে গেল আর শর্মি কৃষ্ণনগরে শ্বশুর বাড়িতেই রইল। ওর আদ্যিকালের মা বলেছিল, দ্যাখ্ এটা কোলকাতা নয়, মফস্সল শহর। শ্বশুরবাড়িতে শাড়ি পরবি, মাথায় ঘোমটা দিবি। বাধ্য থাকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মেয়ে সামলাতে না পারলেও কথা রেখেছিল। যত দিন বাড়িতে আত্মীয়রা ছিলেন শাশুড়ি কিছু বলেননি। শেষ অতিথি চলে যেতে বললেন— নে, এবার এই সব খুলে নিজের মতো করে থাক বাবা। শর্মি যেন বাঁচলো।

শ্বশুরই একমাস পর ওকে লক্ষ্ণৌ নিয়ে এলেন। শুনেই এসেছিল প্রথম কয়েকদিন পিসির বাড়ি থাকতে হবে। ছোটপিসি অর্জুনের কোয়ার্টারটাকে সংসার পাতার উপযুক্ত করে দেবে, তারপর শর্মি ওখানে থাকতে যাবে। মনে মনে এই ব্যবস্থা পছন্দ না হলেও মুখে বলেছিল— সেটাই ভাল হবে মা। সংসার কি করে গুছিয়ে নিতে হয় আমি কি জানি নাকি! ভাগ্যিস ছোট পিসিমা ওখানে আছেন তা না হলে তোমাকেই যেতে হতো— (মনে মনে অর্জুনকে কাছে পেতে বড় ইচ্ছে ছিল)। শাশুড়ি মা বলেছিলেন— যা বলেছিস। তোর ছোটপিসির কাছে আমরা এক টিপ নস্যির মতো। টুনি একাই একশো। বিয়েতে টুনি যা খাটুনি খেটে গেল কম লোকই পারে। ওকে লক্ষ্য করিস, অনেক কিছু শেখার আছে।

লক্ষ্ণৌ স্টেশনে অর্জুন, অর্জুনের চেয়ে সামান্য বড় ব্যাচেলার ভাসুর বাপ্পদা আর ননদ মিষ্টি ওদের নিতে এসেছিল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসার সময় ভিড়ের সুযোগ নিয়ে অর্জুন একহাতে ওকে নিজের শরীরের সঙ্গে সেঁটে নিয়ে চলতে চলতে বলেছিল— রাত্রে আমি ছোটপিসির বাড়িতেই শুতে আসব রোজ।

— ধ্যাৎ! ওরা কি ভাববে বল তো?

— কী আর ভাববে? যা ভাবা স্বাভাবিক তাই ভাববে। ছোট পিসির মস্তবড় বাড়ি, অনেক ঘর, থাকনেওয়ালা তো ওরা চার জন। আমি তো প্রায়ই বাপ্পার সঙ্গে আড্ডা মারার জন্য রাত্রে থাকি ও বাড়িতে, এখন নিজের বৌয়ের সঙ্গে থাকব এটাই তো স্বাভাবিক।

— আমি তো ভেবেছিলাম, বিয়ের সময় মিষ্টির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, তাই ওর সঙ্গে শোবো।

— আমি তুলে নিয়ে চলে আসব।

পিসিমাদের লাল ইঁটের দোতলা বাড়িটা যে অনেক পুরনো দেখলেই বোঝা যায়। সত্যিই বড় বাড়ি। শ্বশুর বলেছিলেন— এরকম কত বাড়ি যে কোলকাতায় ছিল তোমরা তো সেসব দেখনি। কোলকাতা তখন অনেক সুন্দর সিটি ছিল। এসব কথাবার্তার মধ্যেই ছোটপিসি এসে বললেন— অর্জুন সেজদা যে ক'দিন এখানে আছে আর শর্মি যতদিন না তোর ওখানে যাচ্ছে ততদিন তুই এখানেই রাত্রে এসে থাকবি। আর দুপুরে এখানে এসে লাঞ্চ করে যাবি। — শুনে শর্মি বুঝল পিসির নজরে যেন সকলের সব ইচ্ছেই ধরা পড়ে এতই সচেতন তিনি।

মিষ্টি পিসির কনিষ্ঠ সন্তান। বাপ্পাদার ওপরে আর এক মেয়ে আছে। সে States-য়ে থাকে। ওরা বিয়েতে আসতে পারেনি। মিষ্টির বয়স তেইশ বছর, শর্মির চেয়ে দু-বছরের ছোট। বিয়ের সময়েই মিষ্টির সঙ্গে বেশ আলাপ পরিচয় হয়েছিল। মিশুকে মেয়ে মিষ্টিকে দেখতেও ভারী মিষ্টি। গায়ের রং পিসির মতো ফর্সা, কিন্তু মিষ্টি অত লম্বা নয়। অর্ডিনারি গ্র্যাজুয়েট তাই পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের সুযোগ হয়নি। আপাতত ও কিছুই করছে না। ও এই বাড়িতে নতুন বৌদির সারাক্ষণের সঙ্গী। ছোট পিসির যে কখন দিন আর কখন রাত শর্মি বুঝতেই পারল না। মাঝরাতেও পিসিকে কিচেনে দেখেছে উনি পরদিন সকালের নাস্তায় কড়াইশুঁটির কচুরি বানাবেন বলে কচুরির পুর তৈরি করে রাখছেন। ভোর চারটেয় একদিন দেখেছে ছাদ থেকে নেমে আসছেন। দেখেই বুঝেছিল স্নান হয়ে গেছে ওনার। জিজ্ঞেস করেছিল— এতো সকালে ছাদে কী করছিলে ছোট পিসি? মনে হচ্ছে স্নানও করে নিয়েছ?

বললেন— হ্যাঁ রে, চারটের মধ্যে স্নান পুজো করে ছাদ বাগানের গাছগুলোয় জল দিয়ে নেমে আসি। এটা আমার রুটিন বেটা। এখন গিয়ে সারাদিনের মতো সেজেগুজে নেব। সবাই ঘুম থেকে উঠে যেন আমাকে দেখে খুশি হয়ে যায়। দিনটা যেন

ভাল কাটে। তারপর চা বানাবো, সবাইকে গুডমর্নিং জানিয়ে বিছানায় বেড টি দেব। ওদিকে বাপ্পার অফিসের ভাতও হতে থাকবে সকালের নাস্তাও রেডি হয়ে যাবে। রাত্রে সব্জি কেটে রাখি ফ্রিজে। সকলের নাস্তা হয়ে গেলেই রান্না করে নিই ফটাফট। সাড়ে এগারোটার আগেই আমি ফ্রি। তখন আমি বেরিয়ে যাই। ঘুরে ঘুরে এটা-ওটা বাজার করি। তুই তো মিষ্টির সঙ্গে রোজ বেরিয়ে যাস সকাল-বিকেল, তাই জানতে পারিস না যে আমিও বের হই। দেড়টার আগে ফিরে এসে খানা লাগাই। আমি বিকেলেও বের হই রে। টইটই করে ঘুরতে আমার খুব ভাল লাগে।

শর্মি এক্সাইটেড হয়ে বলে— ও ছোটপিসি, তুমি একেবারে আমার মনের মতো মানুষ গো। আমি সারা সকাল-বিকেল ঘুরে বেড়াতাম। মা খুব বকতো, কানই দিতাম না। আমরা ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে দশজন বন্ধু ছিলাম। তারমধ্যে একটা ছেলে শুধু স্কুলে চাকরি পেয়েছিল, বাকি সবাই বেকার। সকাল-বিকেল আড্ডা না মেরে থাকতেই পারতাম না। কোলকাতার আড্ডা জানো তো?

— জানি, মানে শুনেছি। অর্জুনের বন্ধু খবর দিয়েছিল মেয়েটা একদল বেকার বন্ধুর সঙ্গে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। খুব আড্ডাবাজ। তবে খুব ভাল মেয়ে। কারোর সঙ্গে ইয়ে-টিয়ে নেই। নিশ্চিন্তে বিয়ে করতে পারিস।

‘রেসিডেন্সি’র সামনে একটা লাল-কালো বাইক এসে থামল। বাইক থেকে এক সুদর্শন তরুণ নেমে টু-হুইলারটাকে গাছের ছায়ায় পার্ক করে ওটার ওপরেই চেপে বসে পড়ল। ধারে কাছে লোকজন নেই, থাকলে সহজেই বুঝতে পারত যে এই তরুণ কারো জন্য অপেক্ষা করছে। ব্রিটিশদের ছেড়ে যাওয়া ঐতিহাসিক রেসিডেন্সি বর্তমানে সাইট-সিইং স্পট। অথচ ট্যুরিস্টরা এখানে প্রায় আসেই না বলতে হয়। ইতিহাসের গন্ধ শুঁকে তথ্য সংগ্রহে আগ্রহীরাই রেসিডেন্সীর নগণ্য দর্শক। লক্ষ্ণৌ শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে নামমাত্র দূরত্বে এই জায়গায় অফিসপাড়া, স্কুল-কলেজ, শপিং সেন্টার, ঠাসবুনোট রেসিডেন্সির কমপ্লেক্স গড়ে ওঠেনি বলে জায়গাটা পরিচ্ছন্ন এবং নিরালা। নবাব ওয়াজেদ আলির প্রাণের নগরীর কোথাও কোথাও এখনও পথিককে ছায়া দেবার মতো কিছু বট, অশ্বত্থ, শিরিষ বৃক্ষ ঘন পাতার ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। এই জায়গাও সেরকম। রাস্তায় প্রাইভেট কার, অটো রিক্সা, স্কুটার, বাইক হুশ করে চলে যাচ্ছে। যুবক অটো আসছে দেখতে পেলেই সচকিত হয়ে উঠছে, কিন্তু অটোগুলো এখানে থামছেই না। ওর কাঙ্ক্ষিত জনকে নামাবে বলে। কুড়ি মিনিট হলো অপেক্ষা করছে, একটা ফোন করে জানাচ্ছেও না আসতে পারবে কি পারবে না। আস্তে আস্তে অসহিষ্ণু হতে থাকা অতি সুদর্শন দীর্ঘাঙ্গ ছেলে ঠিক করল আর পাঁচ মিনিট দেখে সে স্থান ত্যাগ করে চলে যাবে। পরে যদি আসে তাহলে বুঝুক যে ব্যাপারটা ওরই একার নয়, দুজনের মিলিত পরিকল্পনা। দু-মিনিট পরে একটা অটো এসে থামল আর সেটা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে এগিয়ে এলো সে।

— ক্যা বাৎ হ্যায় ইয়ার! পুরে বাইশ মিনিট মায় ইন্তেজার করা রহাঁ হুঁ, ঔর তুমনে এক ফোন তক্ নহি কিয়া? শরাফৎ ভী নহী হ্যায় ক্যা?

প্রশ্ন এড়িয়ে সে বলল— ওয়া... ও! সফেদ সালোয়ার ঔর লং ব্ল্যাক কুর্তে মে তুম বড়ে অচ্ছে লগ্ রহে হো শাজাদ!

— য়ে জবাব নহী হুয়ি। অচ্ছে ম্যায় হররোজ লগতা হুঁ। মুঝে মালুম হ্যায়। মেরা বাইশ মিনিট টাইম কিসলিয়ে জায়া কীয়া বো বতাও।

— উঁম! তো জনাব গুস্যে মে হ্যায়! ঘর মে মেহমান আয়ে হুয়ে হ্যায় জনাবে আলী। মামাজী নয়ী ভাবী কো সাথ লেকর আয়ে হ্যায়। অগর ম্যায় নিকল জাতি হুঁ তো বেচারি ভাবী সারে বুজুর্গোকে বীচ্ ক্যা অকেলি নহী পড় যায়েঙ্গী? থোড়ী সি দের হো গয়ী পরন্তু আয়ী তো হুঁ। অব মুশকুরা দো প্লীজ!

— আচ্ছা। অব নয়ী ভাবী মুঝসে ভী প্যারী হো গয়ী?... শুন লো, মুঝসে বড় কর ঔর কোই তুমহারী নজর মে জ্যাদা প্যারা নহী হো সকতা। ভাইয়া-ভাবী, মামা-মামী কোই ভী কতেয় নহী। য়্যাদ রখনা। সমঝি?

মিষ্টির মনটা খারাপ হয়ে যায়। শাজাদের অসম্ভব পজেসিভনেসের সঙ্গে ওর পরিচয় আছে। ও বৌদির গল্প করেছে শাজাদের কাছে, বলেছে মাত্র দু-বছরের বড় বৌদির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে কৃষ্ণনগরে মামার বাড়িতে দশদিন থাকার সময়েই। তখন শাজাদ কিছু বলেনি, শুনেছে শুধু। মিষ্টি যে কত সঙ্গোপনে কত সতর্কতা মেনে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে সবই জানে। তবুও অবুঝের মতো ব্যবহার ওর। শাজাদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা কেউ জানে না। মিষ্টির সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বান্ধবীও জানে না। বাড়ির লোক তো দূরের কথা। ওরা এমনিতে যথেষ্ট প্রগ্রেসিভ হলে কী হবে মুসলিম ছেলেকে

ভালবেসে বিয়ে করার কথা কল্পনাও করতে পারে না। ও ছোটবেলা থেকেই দেখছে ওদের বাড়ির ছাদে শীতের দুপুরে পাশাপাশি তিনটে মুসলমান বাড়ির চাচী, ভাবী, দাদী, দিদি— সবাই এসে জমা হয়ে যায় হাতে উল-কাঁটা, চিকনের কাজ করে দেবার অর্ডারি শাড়ি নিয়ে। রোদের তাপে বসে মা'র সঙ্গে আড়াই তিন ঘণ্টা মজলিশও হয়ে যায় সেলাই বোনাও হয়। এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি মেয়েদের আসা-যাওয়ার জন্য ছাদের ওপর ক্যাট-ওয়ে নাকি এই তিনটে বাড়িতে প্রথম থেকেই ছিল। রান্না করা খাবারের বাটিও এই পথেই চলাচল করে। ওর তেইশ বছর বয়সের মধ্যে একবারও এই তিনটে মুসলমান বাড়ির সঙ্গে বাবা-মার মনোমালিন্য হতে দেখেনি ও। বাবা তো গর্ব করে বলে— ওদের সঙ্গে আমাদের তিনপুরুষের সম্পর্ক রে, অটুট বন্ধন বলে বাংলায়। সুখে-দুঃখে আমরা একে অন্যের জন্য আছি।

ঐ পর্যন্তই সীমা। দু-নম্বর বাড়ির আয়েশা দিদির যে ওর দাদা বাপ্পার সঙ্গে মুহব্বত ছিল সেটা ও জানত। আয়েশা দিদির শাদী ঠিক করে চাচা এবাড়িতে বাবাকে বলতে এসেছিলেন— ভাইজান আয়েশার শাদীর দিন ঠিক হয়ে গেছে, আপনারা সবাই উপস্থিত থেকে কাজটা তুলে দেবেন। এত জলদ্‌বাজী করতাম না ওর শাদীর জন্য, কলেজের পড়া শেষ হলে দেব ভেবেছিলাম... কিন্তু বাপ্পার সঙ্গে ওর সম্পর্ক দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল ভাইজান। আপনি বা ভাবীজী বোধহয় জানেনও না। এটা বয়সের ধর্ম। শেষে কিছু ঘটিয়ে ফেলে সেই ভয়ে শাদীই দিয়ে দিচ্ছি। এতে আপনি-আমি দুজনেই বাঁচব। সম্পর্কে ফাটল আসবে না। উপযুক্ত ছেলে আল্লাহ্ জুটিয়ে দিয়েছেন যখন তখন দেরি করার দরকার কি বলুন না? বি এ পাশ করেও রাঁধবে-বাড়বে বাচ্চা পয়দা করবে, না করেও সেই কাজই তো করবে!... ভাইজান... শাদীর আগে বাপ্পাকে কোনো কাজ দিয়ে লক্ষ্ণৌয়ের বাইরে পাঠাতে পারলে নিশ্চিন্ত হতাম। আপনি ছাড়া আর আমরা ছাড়া আয়েশার শাদী তয় হয়েছে একথা অন্য কাউকে এখনও বলিনি।

বাবা জিজ্ঞেস করেছিল— আয়েশা কি জানে যে ওর শাদী পাকা হয়ে গেছে? জানলে তো ওই বাপ্পাকে বলে দেবে।

— না, না, ভাইজান। ও এটুকু জানে যে আমি ওর শাদীর জন্য চেষ্টা করছি, তার বেশি জানে না। বি এ পাশ না করে শাদী করবে না বলেছে। আমি আর বেগম ছাড়া কেউ জানে না ঘরেও।

— খুব বুদ্ধির কাজ করেছ এজাজ। তোমার ভাবীজীও জানবে না। আমি বাপ্পাকে বিজনেসের কাজ দিয়ে নাসিকে পাঠিয়ে দেব ২-৪ দিনের মধ্যে। তুমি তখন সবাইকে জানাবে। আয়েশাকে ক'দিন বাহানা করে ঘরে আটকে রেখো। নিশ্চিন্ত থাকো এজাজ ওরা পালাতে পারবে না। বাপ্পা যেন ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে।

এজাজ চাচা কেঁদে ফেলেছিল। বলেছিল, মজহব মাঝখানে না থাকলে আয়েশা আপনার ঘরে বহু হয়ে এলে আমার চেয়ে খুশ আর কেউ হতো না ভাইজান। মুসলমানের মেয়ে হিন্দুর ঘরে বৌ হলে রায়ট বেঁধে যাবে, কিন্তু হিন্দু মেয়ে মুসলমানকে শাদী করলে জুলুশ বানাবে আমাদের মোল্লারা। সে জন্যই সাবধানে থাকা। বাবা বলল— এর আগেও এরকম ঘটনা এখানে হয়েছে। আমরা তিন পুরুষ ধরে ছলনা করে এদের আটকিয়েছি। যার জন্য এই মহল্লায় অশান্তি হয়নি কখনো। এবারেও হবে না এজাজ নিশ্চিন্ত হও।

মিষ্টি ইচ্ছে করে আড়ি পেতে শোনেনি মোটেই। সেদিন মা, দাদা বাড়িতে ছিল না। মিষ্টি ঘর থেকে বের হতে গিয়ে ওদের কথা শুনে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এজাজ চাচা আর বাবা দালানে বেতের চেয়ারে বসে ঠিক ওর সামনেই কথা বলছিল। ওদের মাঝখানে পর্দাঢাকা দরজাটাই ছিল শুধু। সেদিন ও বুঝতে পেরেছিল, তিনপুরুষ ধরে অটুট বন্ধনের রহস্য হলো পরস্পরের প্রতি আস্থা। দাদা কিছু না জেনেই নাসিকে চলে গেল। মিষ্টিও ষড়যন্ত্রের কথা কাউকে বলেনি। বুঝেছিল বলা উচিত হবে না। তখনও শাজাদ আসেনি ওর জীবনে, মুহব্বতের মর্মই বুঝত না। আজ ওর নিজের জীবনে একজন এসেছে যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। দাদাও নিশ্চয়ই আয়েশা দিদিকে এমন করেই ভালবেসেছিল, তাই বিয়েই করল না আর। ওর কথা জানাজানি হলে বাবাও ওকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দেবে। শাজাদ বুঝতেই চায় না যে ওকে কত ছল-ছুতো করে সারাদিনের জন্য আসতে হয় শুধু শাজাদকে খুশি রাখার জন্য। শাজাদ ওর ব্যাপারে বড্ড হিংসুটে।

মন খারাপের চিহ্ন যাতে মুখের ওপর ছাপ না ফেলে তাই জোর করে হাসিমুখ বানিয়ে মিষ্টি বলল— আমরা কি আজ এখানে রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকব নাকি কোথাও যাব? শাজাদ বাইক স্টার্ট দিতে দিতে বলল— যাব বলেই অপেক্ষা করেছি। তুমি দেরি করলে বলে মেজাজ খারাপ হলো।

— আচ্ছা বাবা! এখন চলো। আমাকে ছ'টার আগে ফিরতে হবে। (ওরা লক্ষ্ণৌয়ের উর্দু-হিন্দি মেশানো মিষ্টি ভাষাতেই কথা বলছিল)

লক্ষ্ণৌ সিটি ছাড়িয়ে বাইপাস দিয়ে তীব্র গতিতে বাইক হাইওয়ের দিকে ছুটে চলেছে। শাজাদকে জড়িয়ে ধরে ওর পিঠে মাথা রেখে মিষ্টি বুঝতে পারছে ওরা পরিচিত হাইওয়ে রিসর্ট 'নবাবী'র দিকে যাচ্ছে। মুখে বললেও কিছুতেই সন্ধে ছ'টার

মধ্যে বাড়ি ফিরতে পারবে না। মা আর বৌদিকে মিথ্যে কথা বলে এসেছে ও। বলেছে ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু সাদিয়া কানপুর থেকে বাপের বাড়ি এসেছে নিউ বর্ন বেবি নিয়ে। ও না গেলে সাদিয়া দুঃখ পাবে।... মা আবার বলে দিয়েছে— বেবি জনসনের বড় সেটটা কিনে নিয়ে যাস— মা ওকে এত বিশ্বাস করে আর ও কিভাবে মাকে চিট করে চলেছে ভাবলে কষ্ট হয়, কিন্তু উপায় কী? শ্যাম রাখি না কুল রাখি কথাটা মার কাছেই শোনা। ওরও যে একই সমস্যা। বন্ধু সাদিয়ার বিয়েতেই শাজাদ আখতারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তারপর প্রেম। তারপর আর যা হয়ে চলেছে সেটার ব্যাখ্যা মিষ্টি করতে পারবে না। পরিণয় না হওয়া পরিণয়ের বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছে ওরা দুজনে। অপ্রতিরোধ্য শাজাদকে বাধা দিতে গেলেই বলত— তাহলে চলো এখুনি কাজীর কাছে গিয়ে নিকাহ্‌নামা পড়ে নিই।

মিষ্টি আঁতকে উঠত। ঢোক গিলে বলত— পাগল নাকি তুমি? তোমার বা আমার কারোও ফ্যামিলি মেনে নেবে না।

শাজাদ বলত— কে বলেছে তোমাকে যে আমার ফ্যামিলি মেনে নেবে না? আমাদের তো দুলহনের বাপের কাছ থেকে দহেজ নেবার প্রথা নেই, উল্টে দুলহাকে ‘দেন মোহর’ দিতে হয়। আমার ফ্যামিলির দহেজের লোভ নেই, তাই না মেনে নেবার কারণও নেই। মানবে না তোমার ফ্যামিলি। কারণ আমি মুসলমান। ওরা ঘরবাড়ি বিক্রি করে মেয়ের শাদী করাবে তবু অন্য ধর্মের ছেলের হাতে মেয়েকে দেবে না। কিন্তু আমি যে তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না। মুসলমানের মুহব্বত সমুদ্রের মতো গভীর, সীমাহীন উত্তাল হয় মীনাক্ষী, একবার সেই সমুদ্রে ডুবলে আর উঠে আসা যায় না। যুগ যুগ ধরে ইতিহাস গাওয়া হয়ে আছে। আর কতদিন এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে চলব বলো? আমার মধ্যে কীসের অভাব আছে বল?

মীনাক্ষী, মিষ্টির অফিসিয়াল নাম। স্কুল-কলেজের রেজিস্টারে সীমাবদ্ধ। শাজাদ ওকে মীনাক্ষী বলেই ডাকে। ওর বলতে ইচ্ছে করে— হিন্দু মেয়ে মুসলমানকে বিয়ে করলে বড়জোর পরিবার তাকে ত্যাগ করে। কিন্তু হিন্দুরা এই নিয়ে রায়ট বাধায় না। এই ব্যাপারে তোমরাই বড় কট্টর। একটা মুসলমান মেয়ে হিন্দু ছেলেকে ভালবাসে জানলেই হলো। আর বিয়ে অব্দি গড়াবে না। তক্ষুনি দাঙ্গা-ফাসাদ লেগে যাবে। তা না হলে আমার দাদা ব্যাচেলার থাকত না, আয়েশা দিদি আমার বৌদি হতো। মিষ্টি এমন কটু কথা মুখে বলতে পারে না। ও বড়ই নরম, শান্তিপ্রিয় মেয়ে, যাদের লোকে দুর্বল চরিত্র বলে ও সেরকম। ও নির্বোধ নয়, পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দ বিচার করার বুদ্ধি আছে, কিন্তু সবই মনে মনে। ও জানে এই যে শাজাদের সঙ্গে মাসে এক-দুবার পরিচিত লোকালিটি থেকে অনেক দূরে কোনো হোটেল-রিসর্টে কয়েক ঘণ্টা একটা রুমের ভেতরে কাটাতে আসে, সেটা ওর মতো গৃহস্থ পরিবারের মেয়েকে শোভা দেয় না। এটা অত্যন্ত খারাপ, খুবই রিস্কি এবং অসম্মানজনকও বটে। এর চেয়ে বিয়ে করে ফেলাই ভাল। কিন্তু কার্যত শাজাদের সঙ্গে নিকাহ্‌নামা, কলমা পড়ার কথা ভাবলেই বুকের মধ্যে হিমবাহ নেমে আসে। একজনকে পাবার জন্য বাবা-মা দাদা সবাইকে হারাতে হবে। ওর লক্ষ্ণৌতে জন্ম, এখানে মুসলমান পড়শীদের মাঝখানে বড় হয়েছে, ওদের ঘরের হাঁড়ির খবর জানে। ওরা মানুষ হিসাবে খারাপ নয়, কিন্তু রীতি-রেওয়াজ, সংস্কার একেবারেই বিপরীত। স্রোতের উল্টো মুখে এত লম্বা জীবন কেমন করে সাঁতার কাটবে এই কথা ভাবলেই ভয়ে গলা শুকিয়ে যায়। শাজাদ শিক্ষিত মুসলমান, খানদানি ব্যবসায়ী ঘরের ছেলে। ও চরিত্রহীন মতলববাজও নয় যে মিষ্টির সঙ্গে কিছুদিন ফুর্তি লুঠে সরে পড়বে। শাজাদের ভালবাসায় কোনো খুঁত নেই। মিষ্টি রাজি হলেই ও বিয়ে করতে প্রস্তুত। মিষ্টি নিজেই দোলাচলে দুলছে, মনকে শক্ত করে হ্যাঁ বলতে পারছে না। বলিষ্ঠ উচ্চারণে ও বলতে পারছে না— যদি আমাকে ছাড়া তোমার বেঁচে থাকাই সমস্যা হয় তাহলে তুমিও তো হিন্দু ধর্মে কনভার্ট হতে পারো। তাহলেই সব সমস্যা মিটে যায়। তোমাদের এত রিজিডিটি কেন যে হিন্দুকেই ধর্মান্তরিত হতে হবে ভালবাসার মানুষটিকে পাবার জন্য? তুমি মামুলি মুসলমানদের মতোও নও, খানদানি বংশজাত শিক্ষিত সংস্কৃতিবান আধুনিক পুরুষ। কাজীর কাছে যাবার কথা না বলে বলতে পারতে স্পেশিয়াল ম্যারেজ অ্যাক্টে বিয়ে করি চলো। তুমি তোমার ধর্ম পালন করবে, আমি আমার। সমাজে মাথা উঁচু করে লিগ্যালি ম্যারেড কাপল হয়ে থাকব আমরা। শুধুমাত্র বায়োলজিক্যাল নীডস্ মেটানোর জন্য ন্যক্কারজনক হোটেল রিসর্টের ঘরে কয়েক ঘণ্টার চেক-ইন চেক-আউটের অসম্মান মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করি চলো। না, মিষ্টি এমন তেতো সত্যি কথা বলতে পারে না।

ওরা রিসর্ট ‘নবাবী’তে পৌঁছে গেছে। রিসেপশন কাউন্টারের ঠিক পেছনেই মস্তবড় স্ক্রীনে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ‘নবাবী’র প্রাইভেট ল্যান্ডে প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে পার্কিং এরিয়া, ওপেন এয়ার সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সব কিছু দেখিয়ে চলেছে, ভেতরেও সি সি টিভির ছড়াছড়ি। টু-হুইলার পার্কিং এরিয়াতে বাইক পার্ক করে ওরা এসে ঢুকতেই ফ্লোর ম্যানেজার হাসিমুখে এসে রেগুলার কাস্টোমারকে স্বাগতম জানালো। বিগত দুবছরের কিছু বেশি সময় ধরে ওরা এতোবার এখানে অতিথি হয়েছে যে রিসেপশনিস্টরা, রুম সার্ভিস বয়রা প্রত্যেকে ওদের চেনে। মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস শাজাদ আখতার সারাদিন

রাতের রুম রেন্ট নিয়ম মতো দেন, কিন্তু থাকেন মাত্র কয়েক ঘণ্টা। দুপুরে লাঞ্চ আর বিকালে হয় চা নয়ত কফি খেয়ে সন্ধে বেলাতেই চেক-আউট করেন। প্রথম প্রথম ওরা সন্দেহ করত রইসজাদা বোধহয় এখানে ফুর্তি করতে আসেন। প্রত্যেকবার একই মেয়ে সঙ্গে আসে দু-বছর ধরে, এটা প্রত্যক্ষ করার পর ওরা বুঝেছে শাজাদ আখতার ওর বিবিকে নিয়েই আসে। মাসে এক-দুবার কয়েক ঘণ্টা একান্ত নিজের মতো করে কাটানোর জন্য নবাবীকে ওদের ভাল লেগে গেছে, তাই এসে সেই যে ঘরে ঢোকে আর বাইরে আসে না চলে যাবার সময় ছাড়া। প্রত্যেকবারই রুম সার্ভিস নেয়, ভাল টিপস্ দেয় রুম সার্ভিস বয়দের। কখনো হার্ড ড্রিংক্স নেয় না, ঝুট-ঝামেলাহীন ডিসেন্ট গেস্ট।

লাঞ্চের পর বিছানায় বালিশে পিঠ দিয়ে বসে শাজাদ বলল— আমি আম্মিজানকে আমাদের কথা বলেছি মীনাক্ষী। আম্মিজান আব্বুকে বলেছে ওদের কোনো আপত্তি নেই। এখন বলটা তোমার কোর্টে। তুমিই বলো কী করতে চাও।

মিষ্টির মুগ্ধ দৃষ্টি লম্বা দুটো পা ছড়িয়ে বসে থাকা অত্যন্ত হ্যান্ডসাম শাজাদকে দেখছিল। এই মানুষটি ওর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়, দেখলে বোঝা যায় না ওর আঠাশ বছর বয়স। ও মিষ্টিকে অন্তর থেকে পেতে চায়। নিজের বেগম বানানোর জন্য ওর চেষ্টার কোনো কম নেই। পরিবারের মত আদায় করে ফেলেছে। আর বাহানা করা চলবে না। আড়াই বছর আগে রূপবান ম্যানলি শাজাদ আখতারের প্রেমে পড়ে হাজার ফুট ওপর থেকে ঝাঁপ মেরেছিল সেদিন পরিণামের কথা মাথায় আসেনি। আজ আর মীনাক্ষী ব্যানার্জীকে বেগম মীনাক্ষী আখতার হতে হবে বলে শোক করে লাভ নেই। এখন সরে যাওয়ার সব পথ বন্ধ। যে পুরুষকে বিশ্বাস করে নিজের কৌমার্য সমর্পণ করতেও দ্বিধা করেনি সে তো বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি! পুরনো লক্ষ্ণৌয়ের বিরাট এক একান্নবর্তী মুসলমান বাড়ির অন্তঃপুরে থাকার আতঙ্ক ত্যাগ করে মনকে শক্ত করার সময় এসে পড়েছে। নিজের ভাগ্য ও নিজেই রচনা করেছে, ভাল-মন্দ যাই হোক সবটাই ওর দায়।

শান্ত গলায় মিষ্টি বলল— খুব ভাল কথা যে ওঁরা রাজি হয়েছেন। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। তুমি শুধু আমার সঙ্গে জল্দবাজি করো না প্লীজ, একটু সময় দিও। আমাকে তো চিরকালের জন্য বাবা-মাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর

কোনোদিন এবাড়ির দেহলীজ (চৌকাঠ) পার হয়ে ভেতরে আসতে পারব না। শেষবারের মতো ওদের সঙ্গে ছায়ার মতো মিশে থাকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করো না।

শাজাদ মিষ্টির কথায় মুভ্‌ড হয়ে পড়ল। সোজা হয়ে বসে ওকে কাছে টেনে নরম সুরে বলল— আমি বুঝি মীনাক্ষী। তুমি আমার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করছ আর আমি আর ক'টা মাস অপেক্ষা করতে পারব না? তুমি যে শাদীতে রাজি হলে তাতেই খুশি হলাম আমি। — মিষ্টির নীরব চোখের জলে শাজাদের বুক ভিজে যাচ্ছিল।

পিসি শাশুড়ির বাড়িতে থাকতে হবে শুনে মনে মনে শঙ্কিত হয়েছিল, কী জানি কেমন হবে ওরা! ওর কোনো স্বাধীনতা থাকবে কিনা, মানিয়ে নিতে পারবে কিনা? এখন ছোট পিসিমাদের সবাইকে ভাল লাগছে। ওরা প্রত্যেকে দারুণ মিশুকে। আর পিসিমার তো জবাব নেই। ভাইপোর কোয়ার্টারে শর্মির নতুন সংসার পাতার সাজ-সরঞ্জাম কিনে সেখানে গিয়ে শশী মাইতি আর শিউশরণকে নিয়ে গোছাচ্ছেন। সংসার যে পাতবে সেই বৌ তখন ননদ মিষ্টির সঙ্গে লক্ষ্ণৌ সিটি চরে বেড়াচ্ছে। নেহাত বিছানার চাদর, বেডকভার, পর্দার কাপড় কেনবার দিন শর্মি আর মিষ্টিকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। অর্জুনের কোয়ার্টার ফার্নিশড্‌ই ছিল মোটামুটি। একজন ব্যাচেলারের থাকার জন্য যথেষ্ট। ফ্রিজ, টিভি, গ্যাস, ল্যান্ড ফোন, সোফাসেট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল— এসব ছিল। পিসিমা পালিশ করিয়ে কসমেটিক সার্জারি করেছেন। একটা ওয়াশিং মেশিন আর অপরিহার্য মাইক্রো ওভেন কিনিয়েছেন ভাইপোকে দিয়ে। কিচেনে শশী মাইতির চাল-ডাল ভাঁড়ার রাখার জন্য ডালডার ডিবে, চ্যবনপ্রাশ ইত্যাদি কৌটোর সংগ্রহশালা হটিয়ে দিয়ে মূল্যবান ব্র্যান্ডেড ডিবে-ডাবা দিয়ে ডি এস পি-র লায়েক কিচেন করেছেন। শর্মি ভালই বুঝেছে যে নতুন বউয়ের সাংসারিক জ্ঞানের ওপর পিসি শাশুড়ি বিন্দুমাত্রও আস্থা রাখেন না। ওর মা এদেশে থাকলে ঠিক একইরকম করত। কারণ মা তো মেয়েকে ছোট পিসিমার চেয়েও বেশি চেনে। লক্ষ্ণৌতে থাকতে হবে বলে ওর মনে এই ক'দিনেই আর আফশোস নেই। স্মার্ট ফোনের দৌলতে কোলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলার সুযোগ যেন বিজ্ঞানের আশীর্বাদ। এদিকে অর্জুনের মতো বরের সঙ্গে প্রথম প্রেমের মোহনীয় আবেশ ওকে আচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছে। ওদের দুজনের শরীর-মন দুইয়েরই সঠিক মিল হয়েছে। খুব সুখী সুখী মনে হয় নিজেকে। পরশু শ্বশুর চলে যাবেন তার দুদিন পর ও চলে যাবে নতুন ঘরের নিজের সংসারে। তখন এককীত্ব কাকে বলে বুঝবে হয়তো। এখানে তো বুঝতেই পারল না যে ও কোলকাতায় নেই। ভাসুর বাপ্পাদার মধ্যে এত বেশি হাসি-মজার স্টক্ আছে যা আগে বেশি দেখেনি। ভাসুর সুলভ ব্যবহার করলই না, সারাক্ষণ শুধু আমোদ করে চলেছে সকলের সঙ্গে, এমনকি মামা আর বাবা-মার সঙ্গেও। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে গরম করে রাখে বাড়ি। অথচ এই মানুষটির কাহিনি বড় বেদনাবিধুর। ছোট পিসিমা নিজে শর্মিকে বলেছেন, কেন ছেলে বিয়ে করবে না বলে পণ করেছে। আর মিষ্টি সত্যিই একটা মিষ্টি মেয়ে। পিসিমার মতই টকটকে ফর্সা রং, সুন্দর দেখতে শুধু অত লম্বা নয়। মিষ্টি ঢিলেঢালা সাদাসিধে এক মেয়ে। না তো রূপের অহঙ্কার আছে না আছে ওভার স্মার্টনেসের চটক। মিষ্টিকে কেউ থাপ্পড় মারলে ও পাল্টা থাপ্পড় মারতে পারবে না এরকম বলে মনে হয়েছে ওর। এমনিতে হাসিখুশি, চট করে মিশে আপন করে নিতে পারে, নতুন বৌদিকে ভালবেসে ফেলেছে। সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছে, সবই করেছে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝেই ও অন্যমনস্ক হয়ে যায় লক্ষ্য করেছে শর্মি।

— অ্যাই মিষ্টি কী হলো? হঠাৎ করে তোমার মন কোথায় উধাও হয়ে যায় ভাই? — জিজ্ঞেস করেছিল একদিন।

মিষ্টি আমতা আমতা করে বলেছিল— কই, না তো! আমি তো এখানে তোমার সঙ্গেই আছি বৌদি!

— উঁহু! মাঝে মাঝে তুমি উদাস হয়ে অন্য কোথাও চলে যাও। প্রেমেটেমে পড়েছ নাকি? বল না আমাকে।

— ধ্যাৎ! কী যে বল?... একথা কেন বললে?

— বললাম, কারণ শুনেছি প্রেমে পড়লে নাকি হঠাৎ হঠাৎ উদাস হয়ে যায় মানুষ। তোমার মধ্যে লক্ষণটা দেখতে পাচ্ছি তো! অ্যাই, সত্যি কথাটা বলেই ফেল না, আমি কাউকে বলব না রে বাবা।

মিষ্টি হেসে ফেলল— সে আমি জানি যে তুমি কাউকে বলবে না। যদি কখনও প্রেমে পড়ি তাহলে তোমাকেই খবরটা প্রথম দেব। তবে, এখনও আমার প্রেমে কেউ পড়েনি তাই আমারও প্রেমে পড়া হয়নি গো।

শর্মি বিশ্বাস করেছিল। ননদ-বৌদির সম্পর্ক দিনে দিনে গাঢ় হয়েছে।

ছোট পিসিমা কালীবাড়ির পুরুতের কাছ থেকে শর্মির নতুন সংসারে প্রবেশ করার শুভ দিন-সময় জেনে এসছেন।

সেই দিন-সময় মেনে পিসিমা নিজে শর্মিকে নিয়ে এসে সংসারে প্রতিষ্ঠা করালেন। ছোট হোম করলেন পুরুতঠাকুর, হাউস-ওয়ার্মিং হলো। এখন উড়নচণ্ডী শর্মিষ্ঠা একা একা গৃহিণী হতে চেষ্টা করছে।

মেজদা শর্মিকে নিয়ে লক্ষ্ণৌ আসার পর থেকে টুনি সময়ই পাননি যে দাদার সঙ্গে বসে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলবেন। শালা-বোনাই জোড় বেঁধে সারাক্ষণ গল্প করছে রাজা-উজির মেরেছে, টুনি চা-কফি সাপ্লাই দিয়েছেন। আজই প্রথম ভাই-বোনে নিভৃতালাপের সময় পেলেন। দুজনের আলাপের বিষয়বস্তু বেশিরভাগই পারিবারিক, কিছুটা অতীতের স্মৃতিচারণ আর অসুখ-বিসুখ কেন্দ্র করেই চলেছে। কথায় কথায় অর্জুনের বিয়ের প্রসঙ্গও উঠে এলো। সঙ্গে বাপ্পা, মিষ্টির কথাও এলো।

মেজদা বললেন— বাপ্পাকে এবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করা টুনি। কতকাল আর একা একা থাকবে? ওর জীবনটা তো ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছে। যার জন্য নিজের জীবনটাকে নষ্ট করে দিল সে তো শুনলাম ছেলে-মেয়ে নিয়ে দিব্যি সংসার করছে। হয়েও তো গেল বেশ কয়েক বছর। জোর করে বিয়ে দে ওকে, দেখবি ভূত নেমে গেছে মাথা থেকে।

টুনি হতাশায় হাত নেড়ে বলেন— সে আশা আর করি না মেজদা। অনেক বুঝিয়েছি, ভবি ভোলবার নয়। আয়েশাটাও চলে গিয়েও পিছু ছাড়ে না। যখনই এখানে আসে আমার বাড়িতেই বেশিরভাগ সময় কাটাবে। আমার কাজে সাহায্য করবে জোর জোর করে, ওনার পায়ের শক্ত নোখ যত্ন করে কাটবে বসে বসে, মিষ্টির মাথায় তেলমালিশ করবে— আরও কত কী! কিচ্ছু বলতে পারি না মেজদা, ওকে দেখে মনে হয়, ওর প্রাণটা এবাড়িতে পড়ে আছে, শরীরটা কানপুরে।

— বাপ্পার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে? ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে?

— না, না। ঘনিষ্ঠ শুধু আমাদের তিনজনের সঙ্গেই হয়, বাপ্পার সঙ্গে কথা বলে খোঁজখবর নেয় ওই পযর্ন্তই। বাপ্পার ঘরে যায় না, সকলের সামনেই সাধারণ কথাবার্তাই হয় ওদের। আমার সন্দেহ নেই যে মনে মনে ওরা এখনও দুজন দুজনকে ভালেবাসে। বাপ্পা বেহুঁশ হয়ে ফাঁদে আটকে আছে স্বেচ্ছায়, ওকে বের করা যাবে না। এখন মিষ্টির বিয়ের ভাবনা করতে হবে। তোমার বোনাইকে তো জানো। তাকে বললেই সে বলে— যার যখন হবার তখন ঠিক বাড়ি বয়ে পাত্র এসে যাবে। অর্জুনের বিয়েটা দেখলে না? বিয়ে নিয়তির লিখন, সময় মহরত এলেই হয়ে যাবে মিষ্টির বিয়ে।... শুনলেও পিত্তি জ্বলে যায় আমার। মেজদা বাধা দিয়ে বলেন— আচ্ছা আচ্ছা, এখন পিত্তি জ্বালিয়ে কাজ নেই বরং কোমর বেঁধে লেগে পড়। আমরাও ওদিকে খুঁজি তুই এদিকে চেষ্টা কর। চিন্তু করিস না মিষ্টি দেখতে সুন্দর, ওর ভালই বিয়ে হবে।

— তোমাদের আশীর্বাদে তাই যেন হয়। ওকে আমি রান্নাবান্না সেলাই-বোনা সবই শিখিয়েছি। আসলে মেয়েটা বড্ড চাপা, মুখ ফুটে ইচ্ছে অনিচ্ছে বলতে পারে না, তাই ওকে নিয়েই আমার বেশি চিন্তা। তোমরাও কোমর বেঁধে লেগে পড়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর বিয়েটা হয়ে গেলে বাঁচি। বয়স তো চব্বিশ হতে চলল। এখনকার মেয়েরা কত রকম ডিগ্রি ফিগ্রি নিচ্ছে, আমার মেয়ে অর্ডিনারি মেয়ে, সামান্য বি-এ পাশ। আহামরি পাত্র আমি আশা করি না মেজদা। মোটামুটি ভাল পরিবার, সৎচরিত্র, শিক্ষিত ছেলে হলেই চলবে।

— তুই এত হীনমন্যতায় কবে থেকে ভুগছিস রে টুনি? আমাদের সমাজে গ্র্যাজুয়েট সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়ের চাহিদা কম নেই জেনে রাখ। তাহলে তো অর্জুনও বলতে পারত লেডি আই পি এস অথবা আই এ এস বৌ চায়। শোন, অভিজাত বংশগুলো এখনও আলট্রা মডার্ন হয়ে যায়নি। বৌ বেশি বিদ্বান হয়ে ড্যাং ড্যাং করে চাকরি করতে যাবে আর বাড়িতে ডান্ডা ঘোরাবে আমরা এসব খুব একটা পছন্দ করি না। বৌ মোটুমুটি শিক্ষিতা হবে, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারবে, এমন পাত্রী এমন পরিবারই খুঁজি। শর্মিকে পছন্দ করার পেছনেও এই পয়েন্টগুলো ছিল। দেখছিস তো কত ভাল বৌ হয়েছে। সেকেন্ড ক্লাস এম এ পাশ— যথেষ্ট। চাকরি তো করবে না। অর্জুনের লাইফ স্টাইলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে, এটাই আমরা বিচার করেছিলাম। মিষ্টির বেলায় রেকম পাত্র পেলে কি ছেড়ে দেব? বোকা বোকা কথা বলিস না তো! ওর কয়েকটা ফটো আমার স্যুটকেসে ভরে রাখ গে যা এখুনি, পরে ভুলে যাবি।

শর্মি প্রাত্যহিক ফোনাফোনি করছিল শ্বশুর বাড়ি, বাপের বাড়িতে। স্নান, ঠাকুরের আসনে প্রদীপ জ্বালানো, ব্রেকফাস্ট, অর্জুনকে অফিসে পাঠানো হয়ে গেলে ফ্রি হয়ে বিএসএনএল-য়ের সরকারি ল্যান্ড লাইনে বসে পড়ে। কোলকাতা আর কৃষ্ণনগরে কথা বলে ওদিকে দুই পার্টির সঙ্গে

ব্যালেন্স বজায় রাখে। আজও তাই করছিল। এমন সময় মিষ্টি এলো। ওকে দেখেই খুশি হয়ে গেল মন। মিষ্টির আসা মানেই হজরতগঞ্জ বা আমিনা বাগের বাজারে ঘুরে ঘুরে উইনডো শপিং করা। কখনও ছোটখাটো কিছু কেনা আর টুন্ডা টিক্কা খাওয়া— মানে দিনটা ভালো কাটানো। মিষ্টি আগে থাকতে জানান না দিয়ে হুটহাট এসে ওকে বের করে নিয়ে যায় বলে আরও ভাল লাগে। ছয় মাস হয়ে গেল লক্ষ্ণৌয়ে এখনও একা একা বাইরে কোথাও যেতে ভয় পায় ও। প্রত্যেকদিন ওকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া অর্জুনের পক্ষে অসম্ভব। মিষ্টি এই অভাব মিটিয়ে দেয়। ফোন রেখে এসে মিষ্টিকে জড়িয়ে ধরে বলে— তুই এসে বাঁচালি ভাই। মিষ্টি বলল— আমিনা বাগে সেল চলছে, যাবে নাকি? খুব সুন্দর কুর্তি পাওয়া যাচ্ছে মা দেখে এসেছে। যাবে তো বল।

— যাব তো বটেই। কুর্তি না পেলেও ফুর্তি তো করতে পারব, বল? লাঞ্চ করেই চল বেরিয়ে পড়ব।

সত্যিই চমৎকার কামিজ, লং কুর্তি, শর্ট কুর্তির হিউজ কালেকশন। ইক্কত, কলমকারী, ফুলকারী, বাঁধনী, রাজস্থানী প্রিন্ট, চিকন— কী নেই? সবই পিওর কটন। ঘুরে ঘুরে বেছে বেছে আড়াই ঘণ্টা ধরে অনেকগুলো কটন কুর্তি কিনে ফেলল নিজের আর মিষ্টির জন্য। ভিড়ও ভালই হয়েছে, তবে মেয়েরাই বেশি। পুরুষের ভিড় কম বলেই হয়তো ওর মনে হলো একজন দারুণ হ্যান্ডসাম ছেলে ওদের দুজনকে ফলো করে চলেছে। দু-বার ওর সঙ্গে চোখে চোখ পড়েছে। ছেলেটাই আগে চোখ সরিয়ে পুরুষদের কুর্তা-পাজামায় মন দিয়েছে। মিষ্টির এসব দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। রাশি রাশি পোশাকের জঙ্গলে ও হারিয়ে গেছে আবার।— অ্যাই মিষ্টি! ঐ ছেলেটাকে দ্যাখ, মনে হচ্ছে আমাদের ফলো করছে। আমরা যখন যে স্টলে যাচ্ছি সেখানে আসছে।

মিষ্টি ঘুম ভেঙ্গে সদ্য জেগে ওঠা গলায় নির্লিপ্ত ভাবে বলল— কোথায়?

— ঐ তো। লম্বা, লালচে মুখে স্টাইলিশ চাপ দাড়ি, দেখতে একেবারে কিউপিড যেন! কালো চুড়িদারের ওপর কাঁচা হলুদ রংয়ের কুর্তা পরেছে। মিষ্টি একবার তাকিয়েই বলল— ঐ মুসলমান ছেলেটা? ভয় পাচ্ছ কেন? ও আমাদের ফলে-টলো করছে না। এই সব বনেদি খানদানি মুসলমান ছেলেরা পথেঘাটে অসভ্যতা কখনো করে না। ওরা নিজের বনেদি ইজ্জত সামলাতেই ব্যস্ত থাকে। ও হয়তো ওর জন্য ওর বিবির জন্য কিছু কিনতে এসেছে।

— তুই কী করে জানলি ও মুসলমান?

— লক্ষ্ণৌয়ে জন্ম-কর্ম আর মুসলমান চিনব না? ওর চেহারা ছবিতেই ছাপ মারা আছে নবাব ওয়াজেদ আলির ফেলে রেখে যাওয়া কুটুমদের নাতিপুতি হবে হয়তো। তুমিও তো বললে কিউপিড!

— জানিস ও আমাদের দেখছিল কিন্তু! দু'বার আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট আই কনট্যাক্ট হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নামিয়ে ফেলেছে বটে, কিন্তু...

— ও... ও। চোখ মেরে দাওনি তো তুমি? ছেলেটা চাইলেও চোখ মারবে না।

— যাহ্। আমাকে চোখ মারলে আমি চড় মেরে দিতাম।

— ভাগ্যিস মারোনি। ছেলেটা চোখ মারার কথা কল্পনাও করতে পারবে না।

— অ্যাই তুই অচেনা একটা মুসলমান ছেলের হয়ে এত সাফাই দিচ্ছিস কেন রে? আমি কানা নই বুঝলি? ও আমাদের পেছন পেছন থাকছে সর্বক্ষণ। তোকেই দেখছিল বোধহয়।

— আরে দেখুক না বাবা! আমরা তো বোরখা পরে হিজাব বেঁধে রূপ লুকোই না। ওদের এতো সুন্দর সুন্দর মেয়েগুলোকে তো দেখতে পায় না, না হয় আমাদের একটু দেখেইছে তাতে কী হলো? তবে এরা খারাপ না বৌদি। ছেড়ে দাও, চলো এবার এখান থেকে বেরিয়ে যাই।

— ক্যাসী লগী মেরী ভাবী?

— শেরনী জ্যাসী। আঁখে তো নহী দো পিস্ জ্বলতা হুয়া চারকোল হ্যায়। পিছে মুড় মুড় কর দেখ রহী থী। উনহোনে ক্যা কহা? উনকো পতা তো নহী চলা য়্যে তুমহারী প্ল্যান থী?

— নহী, পতা নহী চলা। উনহোনে কহা— মিষ্টি হমারে পিছে এক জালিম কাফী দের সে ফলো কর রহা হ্যায়। দেখনে মে মহিষাসুর জ্যাসা। দাড়িওয়ালা হাট্টাগাট্টা বো আদমী গুণ্ডা, বদমাশ, লুটেরা কুছ ভী হো সকতা হ্যায়। চল্ জলদী য়্যাহা সে নিকল চলতে হ্যায়।

— আচ্ছা? আল্লাহ কা য়্যে দিওয়ানা বান্দা কিতনা খুশ নসীব হ্যায় দেখো মীনাক্ষী। ভাবী কে সঙ্গ রহ কর ছে মহিনে মে তুমহারা স্মার্টনেস মে ইজাফা হুয়া। কিতনে বারিখী সে তারিফ লায়েক ঝুট বোলনে লগী হো তুম! ভাবীজান মেহেরবান! ইনশাল্লাহ্ এ্যাট লাস্ট তুম স্মার্ট বন গয়ী হো।

অর্জুন দশদিনের ছুটি ম্যানেজ করে শর্মিকে নিয়ে হিমাচল প্রদেশে বেড়াতে এসেছে। বিয়ের পর সাত মাসের মাথায়। ওরা হানিমুন করতে যায়নি আগে, ছয় মাস লক্ষ্ণৌতেই কেটেছে। ছোট পিসির বাড়ি আর নিজের কোয়ার্টারে হানিমুন পর্ব খারাপ লাগেনি ওদের। এতদিন পর ছুটির মুডে পূর্ণ অবকাশে প্রতি পল অনুপল একসঙ্গে কাটানোর সুযোগ সুদে-আসলে তুলে নিচ্ছে দুজনে। ডালহৌসি পাহাড়ে নিরালা হোটেল স্যুটে এই বুঝি কেউ এসে পড়ল, এই বুঝি কেউ দেখে ফেলল— এই ভয়হীন স্বাধীনতায় দুটো পাখি অনুক্ষণ একাত্ম হয়ে সঙ্গ সুখ অনুভব করে চলেছে। ডালহৌসি, খারজাই, ছাম্বা, চামৌলি শর্মি আগেও বেড়িয়ে গেছে বাবা-মা, আর বাবার অফিস পার্টির সঙ্গে কিন্তু সেবার আর এবারের আসায় অনেক পার্থক্য। জীবনে ভালবাসার প্রথম পুরুষটির সঙ্গে বেড়াতে আসার প্রত্যেকটা মুহূর্ত রোমাঞ্চকর। এখানে আসায় যেন দুজনের মনের দরজা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে গেছে, দুটো প্রাণের মাঝখানে আর বিন্দুমাত্রও দ্বিধা, সংকোচ, গোপনীয়তা অবশিষ্ট নেই। 'সুখি জীবনের সুখের গান' গুনগুন করে ওদের ধন্য করছে। একে অন্যের সমস্ত ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে সমর্থ এই ধ্রুব সত্যটা প্রমাণ হয়ে গেছে। তাই দীর্ঘ দাম্পত্যের শক্ত ভিত প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ওরা সুখে থাকবে এবং অন্যদের সুখে রাখবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, এতোটাই মনের মিল আছে দুজনের।

প্রাণে একরাশ রোদ্দুর আর মুঠোমুঠো জ্যোৎস্না নিয়ে ফিরে এসেই ছোট পিসির বাড়ি গিয়েছিল ওরা। সেখানেও খুশির ছোঁয়া লেগেছে। বাবা ফিরে গিয়ে মিষ্টির বিয়ের জন্য সত্যিই কোমর বেঁধেছেন। দুটি পাত্রের সন্ধান দিয়েছেন— দুটিই ভাল। কথাবার্তা হচ্ছে ফোনে। একটায় অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, এখন দেখা যাক। মিষ্টি আর ও ছাদে চলে গিয়েছিল, শর্মি প্রিয় ননদের কাছে মন খুলে বেড়ানোর গল্প, অর্জুনের সঙ্গে কাটানো দশটা দিনে দুজনের মানসিক নৈকট্য কী করে আরও বেড়েছে, ওরা কত সহজে নানা বিষয়ে একমত হতে পেরেছে— সব বলল। মিষ্টি সব মন দিয়ে শুনল, কিন্তু বিশেষ কিছু উক্তি করেনি। ওর নীরবতা শর্মির ভাল লাগে না। খোঁচা দিয়ে যেন ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে— অ্যাই, তুই আবার গুম মেরে গেছিস? আমি এতো কথা বললাম, আর তুই একটা প্রশ্নও করলি না? যাহ্! কত খুশি হয়ে এসেছিলাম, তুই জল ঢেলে দিলি। আজ তোকে বলতেই হবে, তুই কী নিয়ে এত ভাবিস। বল। মিষ্টি এতক্ষণে গা ঝাড়া দিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলে— আরে আমি তো মন দিয়ে তোমার কথাই শুনছিলাম রে বাবা! জিজ্ঞেস করে দেখ, সব ঠিক ঠিক বলতে পারব।

— বেশ, মেনে নিলাম। এবার তোর কথা বল। পাত্র দুটোর ফটো দেখেছিস? পছন্দ হয়েছে? না হলে বলে দিস কিন্তু, এটা সারা জীবনের ব্যাপার তো!

— মা দেখতে দিয়েছিল। আমার পছন্দ অপছন্দে কী যায় আসে? ওরা তো দেখছে, ওরাই ভাবুক।

— সে কী রে? কাকে বিয়ে করছিস, সে কেমন দেখতে জানবার কৌতূহল হচ্ছে না তোর? অদ্ভুত মেয়ে তুই! সত্যি কথা বল তো তুই কি কাউকে ভালবাসিস? বাড়িতে যে কথা বলতে পারছিস না! আমাকে বিশ্বাস করে বল না আমি বোঝাবো পিসেমশাইদের।

মিষ্টি বলল— না বৌদি। আগেও বলেছি এখনও বলছি ওসব নয়। আসলে বিয়ে-টিয়ে নিয়ে আমি কিছু ভাবিনি এখনও। তাই কৌতূহল নেই। বাবা-মা ওদের দায়িত্ব পালন করছে করতে থাকুক। আমি ফটো দেখে কী করব? আমি নিজের মনকেই প্রস্তুত করতে পারিনি। তোমার বিয়েটা সবদিক দিয়ে ভাল হয়েছে বলে আমারও একইরকম হবে সেটা কি বলা যায়? তুমি ভাল, মামা-মামি-ছোড়দা ভাল, তাই তোমাদের বিয়েটা সার্থক হয়েছে, আমার তো নাও হতে পারে। তখন কী হবে?

— হুঁম। বুঝলাম তোর মধ্যে একটা ফিয়ার ফ্যাক্টর কাজ করছে। জানিস, তুই আমার থেকে শতগুণে ভাল মেয়ে। তুই আমার মতো বহির্মুখী নোস, তর্কবাজ নোস, কথার অবাধ্য নোস, ঘরের কাজকর্ম জানিস, তাহলে তোকে কেন ভালবাসবে না লোকে? তুই যেমন চট করে সবাইকে আপন করে নিতে পারিস সেরকম ক'জন মেয়ে পারে? বিয়ের আগে মা আমাকে বুড়ো বয়সে বকে বকে শিখিয়েছে বলে ম্যানেজ করতে পারছি, আর তুই তো ছোটবেলা থেকেই পিসিমার বাধ্য মেয়ে হয়ে সংসারের নিয়মকানুন সব শিখেছিস, মিষ্টি তাহলে এতো ভয় পাবার কী আছে? তোর স্বভাব সুন্দর, তুই সুন্দর তোকে শ্বশুরবাড়ি ভালবাসতে বাধ্য হবে। কোনো ভয় নেই, তুই আমার থেকেও অনেক বেশি সুখ দিতে পারবি ওদের। ওরা এমন বৌ পেয়ে বর্তে যাবে রে। তোকে মাথায় করে রাখবে, দেখে নিস। মিষ্টি ছোট্ট করে বলল— দেখি কী হয়।

অর্জুন বেশ রাত করে বাড়ি ফেরে। ডিনার করতে ওদের

LAUREL

With Best Wishes From-

PRAKASH-PRAMOD BAID

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

(Investment Advisor Mutual Fund Distributor)

JAIN BAID & COMPANY

(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001
Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341, Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

রোজই দেরি হয়। আজও এগারোটার পর ওরা ডিনারে সবে বসেছে, তখন বাপ্পাদার ফোন এল— অর্জুন, মিষ্টি কি তোদের ওখানে?

— না তো! কেন কী হয়েছে?

— মিষ্টি বাড়ি ফিরতে এতো রাত করে না তো কখনো। সাড়ে এগারো বাজতে চলেছে, এখনও আসেনি, তাই চিন্তা হচ্ছে রে!

— কোথায় গেছে বলে গিয়েছিল?

— না রে! চারটের সময় নাকি বেরিয়েছে, মা বলল।

— আর একটু সময় দেখ দাদা। বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে হয়তো কোনো বন্ধুর বাড়ি গেছে, খেয়ে আসবে। ওরাই পৌঁছে দেবে।

— তাহলে তো একটা ফোন করত, ফোন তো সুইচড্ অফ করে রেখেছে।

— তাই নাকি? দাঁড়া, আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি।

কোনোমতে একটু গলাধঃকরণ করে ওরা গাড়িতে উঠে বসে পড়েছিল। — মিষ্টির কি লাভার টাভার ছিল? তুমি কিছু জানো?

না গো, ওর লাভার ছিল না কেউ। থাকলে আমাকে বলত। আমি জিজ্ঞেস করেছি কয়েকবার, ও বলেছে প্রেমে পড়লে ও আমাকে প্রথম বলবে।

— তোমরা দুজনে ঘুরে বেড়াতে, মিষ্টির সঙ্গে কোনো ছেলেকে কথা বলতে দেখেছ কখনো, কিংবা অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছ কি কখনো, যা হয়তো তখন সন্দেহজনক বলে মনে হয়নি? একটু মনে করার চেষ্টা কর। খুব ছোট ছোট মামুলি সূত্র থেকে কিন্তু ক্লু খুঁজে পাওয়া যায়।

— অর্জুন তুমি সন্দেহ করছ মিষ্টি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে?

— একজ্যাক্টলি। যে মেয়ে এতোকাল একা লক্ষ্ণৌ শহরে ঘুরে সময়মতো বাড়ি ফিরেছে, দেরি হবে বুঝলে ফোন করে জানিয়েছে, সে বিয়ে পাকা হতেই আজ এতো রাতেও বাড়ি ফিরল না, ফোন বন্ধ করে রেখেছে— এসবের একটাই মানে। প্রথম অ্যাঙ্গেল বলে ধরে তদন্ত শুর করতে হবে।

— এমনও তো হতে পারে অ্যাকসিডেন্ট অথবা কিডন্যাপ....

— না শর্মি, তাহলে এতো ঘণ্টায় আমি জানতে পারতাম। পিসেমশাইয়ের বাড়িতে পুলিশই খবর দিত। ওর সঙ্গে একটা স্মার্ট ফোন আছে, সেটাই কাজে লাগাতো পুলিশ। তুমি কিছু মনে করতে পারলে?

শর্মি আমতা আমতা করে— আমার যা মনে পড়ছে তার সঙ্গে এই ঘটনার সংযোগ থাকতেই পারে না। সে একেবারে ফালতু ব্যাপার।

— আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি, ভণিতা না করে তাড়াতাড়ি বল।

শর্মি আমিনা বাগের সেল বাজারে সেই ছেলেটার কথা, মিষ্টির মতামত, ওর নিজের সেদিনের মতামত— সব খুলে বলল অর্জুনকে।

— এটা সাধারণ নয়, সম্ভবত মোস্ট ভাইটাল পয়েন্ট।

ঘরে ঢুকে পিসি-পিসোকে দেখে ওদের দুজনেরই ভীষণ খারাপ লাগল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যেন ওরা মারাত্মক কোনো অসুখে আক্রান্ত হয়েছেন। অর্জুন বলল— অতো ভেঙ্গে পড়ো না, মিষ্টিকে খুঁজে বের করবোই আমি। ছোটপিসি, মিষ্টি যখন বেরিয়েছিল তুমি কি দেখেছিলে?

— হ্যাঁ। ও আমার সামনেই বেরিয়েছে। ও চলে যেতেই আমি দোতলায় গেট বন্ধ করে ভেতরে এসেছিলাম।

— ওর সঙ্গে কী ছিল... মানে বড় ব্যাগট্যাগ ছিল কি?

— না রে। কাঁধে ঝোলানো রোজকার লেদার পার্সটাই ছিল শুধু।

— চিঠি-ফিটি রেখে গেছে কিনা খুঁজেছো?

— না তো! তুই এসব কেন জিজ্ঞেস করছিস?

— দরকার আছে বলে। ওর রুমে চলো, খুঁজতে হবে।

মিষ্টির রুম, বিছানা, আলমারি, চেষ্ট অফ ড্রয়ার্স খুঁজে দেখা গেল কোনো চিঠি নেই। জামাকাপড়ও নিয়ে যায়নি। দরকারি কাগজপত্র রাখার ফাইলটাতে শুধু অ্যাডমিট কার্ড, পাসিং সার্টিফিকেটস, বার্থ সার্টিফিকেট আর ভোটার আই ডি নেই। ছোট পিসি নিজেই বলল— ও হারিয়ে যায়নি রে, প্ল্যান করে আমাদের মুখে কালি দিয়ে চলে গেছে। খুঁজে আর কী করবি?

অর্জুন বলল— এখন এসব ভাববার সময় নয়। আমাকে খুঁজতে হবেই, আমার বোন কোথায় গেল, কেন গেল? দাদা তুই এক্ষুনি লোকাল থানায় গিয়ে একটা মিসিং ডায়েরি করে দে। আমি ফোন করে দিচ্ছি ডিউটি অফিসারকে। আমাকে এখুনি গিয়ে কন্ট্রোল রুমে বসতে হবে। তুই আর শর্মি বাড়িতেই থাকবি। ছোট পিসি দাদাকে মিষ্টির একটা রিসেন্ট ফটো দাও ডায়েরি করাতে ওটা লাগবে। আর আমাকে কয়েকটা হাফ-বাস্ট, ফুলসাইজ ফটো দাও তাড়াতাড়ি। — অর্জুন লোকাল থানায় ফোনে কথা বলতে লাগল।

রাতের বাকি প্রহরগুলো লক্ষ্ণৌ সেন্ট্রালের কনট্রোলরুম থেকে একবারের জন্যও ওঠেনি অর্জুন। লক্ষ্ণৌয়ের চারপাশে

অন্তত একশো মাইল ব্যাসার্ধে সমস্ত থানা, পুলিশ চৌকি, হাইওয়ে পেট্রোলকার সবাই পনেরো মিনিটের মধ্যে কাজে লেগে পড়ল সদ্য প্রমোশন প্রাপ্ত ডি এস পি সাহেবের আদেশে। সিটির সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল, মর্গ থেকে ভোর বেলাতেই খবর এসে গেল কাল রাত্রে এইবয়সী কোনো মেয়ের অ্যাকসিডেন্ট কেস আসেনি। মর্গেও ওরকম ডেডবডি আসেনি। ধাবা, হোটেল, লজ, রিসর্টগুলো ইন্সপেক্টার, সার্কল ইন্সপেক্টারদের নজরদারিতে তল্লাশি হচ্ছে, সেগুলো থেকেও খবর আসতে লাগল একে একে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত ম্যাসিভ হান্টের রেজাল্ট জিরো। আর্জেন্সি, ইমার্জেন্সি আর সিক্রেসির বহর দেখে পুলিশরা অনুমান করছে এটা নিশ্চয়ই হাই প্রোফাইল ভি আই পি কেস, তা না হলে ডি এস পি সাহেব নিজে কন্ট্রোল রুমে ঘাঁটি আগলে মনিটর করতেন না। তাই পুলিশ বাহিনীও তৎপরতায় কম রাখছে না কিছু।

অর্জুন এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে, মিষ্টিকে এভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে স্বেচ্ছায় পালায় তাকে খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। সহজ সরল বোনটা যে এমন করতে পারে সেটা কল্পনাও করেনি কখনও। ও যে কার খপ্পরে পড়েছে কে জানে! চব্বিশ বছরের অ্যাডাল্ট, নিজে পালিয়েছে, আইনত কিছু করতে পারবে না। তবুও কোথায় গেল কেন গেল কার সঙ্গে গেল এটা ওকে জানতেই হবে। এটুকু ওর এক্তিয়ারের মধ্যে আছে। হাত গুটিয়ে ফেলবে না কিছুতেই। আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে হদিশ খুঁজে বের করবেই। এখন সকাল ন'টা, কাল রাত থেকে শুধু কফির পর কফি খেয়ে একটানা বসে আছে। অন্য কারও হাতে ছাড়তে পারছে না নিজের পরিবারের ব্যাপার। জানাজানি হলে ওরও লজ্জা— আবার কোনো খবর এসেছে।

— হ্যাঁ, বোলিয়ে।

— স্যার, ম্যায় সার্কেল ইন্সপেক্টর দেশপাণ্ডে। ইস সময় ম্যায় লক্ষ্মৌ-আগ্রা হাইওয়ে পর রিসর্ট নবাবী মে হুঁ। লড়কি কা পতা মিল গয়া স্যার। লড়কি এক মুসলমান লড়কে কে সাথ ইস রিসর্ট মে আতি থী। লড়কা কা নাম শাজাদ আখতার।— এরপর দেশপাণ্ডে বিস্তারিত ভাবে সব খুলে বলে।

সব শুনে অর্জুন বলল— আপ হোটেল ম্যানেজার কো বোলিয়ে সিসি টিভি অপারেটার কো বুলায়েঁ। ম্যায় পৌঁছনে তক বোহ আ যানা চাহিয়ে।

— উসকো বুলা লিয়া স্যার। অপারেটার কাম কর রহা হ্যায়। আপ আতে আতে দো সাল কা ফুটেজ নিকল যায়েগা স্যার।

— ও. কে. দেশপ্যাণ্ড, ওয়েল ডান। ফুটেজ কা ভিডিও রেকর্ড লে লেনা।

চুল মুঠো করে ধরে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল অর্জুন। কাকে জানাবে? কী করে বলবে পিসিদের? শর্মির কাছে আমিনা বাগের অ্যাংগল পেয়ে থেকে যে ভয়টা করছিল, সেটাই হলো। কী সর্বনাশ করল মিষ্টি! নাহ্, আর ওকে ফেরত পাওয়া যাবে না। এতক্ষণে ওর নিকাহ্ হয়ে গেছে নিশ্চয়। একটা হিন্দু ব্রাহ্মণ মেয়ে এতক্ষণে অমুক বেগম হয়ে গেছে স্বেচ্ছায়। নিজেকে কনট্রোল করে ও কর্তব্যের ডাকে দাদার নম্বর ক্লিক করল।

— হ্যাঁ, বল অর্জুন। — সঙ্গে সঙ্গে বাপ্পার রেসপন্স এলো।

— দাদা, তোরটা লাউড স্পিকারে নেই তো?

— না। কেন, কী হয়েছে? মিষ্টি ঠিক আছে তো?

— একটা খবর পাওয়া গেছে। তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে এখুনি। ওর অ্যাকসিডেন্ট হয়নি, অন্য কোনো বিপদ হয়নি। খুব সম্ভব ও বিয়ে করে ফেলেছে। বাড়িতে কাউকে এসব বলিস না এখন। আগে আমরা গিয়ে দেখে আসি। আমি এসে হর্ন বাজাব, তুই অ্যালার্ট থাকিস। রওয়ানা হচ্ছি দাদা।

'নবাবী'তে এসে সব দেখে শুনে আর কোনো সংশয় রইল না। শর্মির আমিনা বাগের বর্ণনার সঙ্গে শাজাদ আখতারের চেহারা মিলে গেছে। ওরা পৌঁছবার আগে দেশপাণ্ডে স্মার্টলি অনেক কাজ এগিয়ে রেখেছে। নিজের নাম, ফোন নম্বর, বাড়ির ঠিকানা ছেলেটা প্রত্যেকবারই সঠিক লিখেছে রেজিস্টারে— এই খবরগুলো দেশপাণ্ডে জোগাড় করে ফেলেছে ওর সোর্সের মাধ্যমে। শাজাদের বাবার নাম ইম্‌তিয়াজ আখতার। বিজনেস ম্যান। বাপ-বেটা কারোই পুলিশ রেকর্ড নেই। ভদ্র, সভ্য মুসলমান পরিবার। ইমতিয়াজ আখতারের অফিসের ফোন নম্বরও পেয়ে গেছে করিতকর্মা এস আই দেশপাণ্ডে। বাপ্পা আসার পথে অর্জুনের কাছে শুনেছিল কেন ওরা 'নবাবী'তে যাচ্ছে। এখানে আসার পর ও একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। নির্বাক দর্শক শ্রোতা হয়ে দেখেছে শুনেছে। ফেরার সময় গাড়িতে বসে অর্জুন চোয়াল শক্ত করে বলল— বিয়েটা যদি এখনও না হয়ে থাকে তাহলে আমি মিষ্টিকে তুলে নিয়ে আসব। বিয়ে হয়ে গেলে কিছু করতে পারব না রে দাদা। সারা জীবনের মতো আফশোস থেকে যাবে।

এতক্ষণে বাপ্পা মুখ খুলল— ফিরিয়ে আনতে চাইছিস কেন? মিষ্টি তো ভালবেসে ওর সঙ্গে ঘর করবে বলেই পালিয়েছে। শুনলি তো নবাবীতে প্রত্যেকটা কর্মচারী ছেলেটার প্রশংসা করছিল। ভাল ছেলে না হলে মিষ্টি ভালবাসতো না।

অর্জুন বিরক্ত গলায় বলে— কী আবোল তাবোল বলছিস তুই? ভালবেসেছে বলে মুসলমানের ঘরে বিয়ে করে মুসলমান

হয়ে যাবে, আর আমরা কিছু করব না? এতোই যদি ভালবাসা তাহলে ছেলেটা কেন হিন্দু হয়ে বিয়ে করল না, বল? ওসব ফিল্মি দুনিয়ায় চলে দাদা, আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে চলে না। খ্রিস্টানদের সঙ্গে তবুও টিকে যায় বিয়েটা, কিন্তু মুসলমানের সঙ্গে কোনোভাবেই টেকানো যায় না রে। কতই তো দেখলাম।

— আয়েশা কিন্তু নিজে থেকে হিন্দু হয়ে আমাকে বিয়ে করতে রাজি ছিল...

— থাম। আয়েশা হিন্দু হলে তোদের সবাইকে কচুকাটা করে মেরে ফেলত। আয়েশা, এজাজ চাচা-চাচী কাউকে ছাড়ত না। মসজিদ থেকে ফতোয়া জারি করে তোদের দুটো পরিবারকেই নিকেশ করে দিত। মিষ্টি বড় ভুল করে ফেলল। নিজের জীবনটা দাঁও লাগিয়ে দিল। ধর্ম তো যাবেই জানি, বিয়েও যাবে। ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, সংসার করা অসম্ভব একজন হিন্দু মেয়ের পক্ষে। অসম্ভব!

— তুই কী করতে চাস তাহলে? আমার মনে হয় না মিষ্টি শাজাদকে ছেড়ে আসতে চাইবে। আমার কেসটা যাতে ওরও না হয় সেজন্যই ও চলে গেছে।

অর্জুন বাপ্পার কথার উত্তর দেয়নি। ও কেসটা নিজের হাতে রেখেছে নিজের মতো করে শেষ অব্দি চেষ্টা করবে বলে। দাদার ইমোশন্যাল কথা ওর পছন্দ হয়নি। বাস্তবে স্বপ্নের কোনো ঠাঁই নেই। দাদাকে কালীবাড়ির মোড়ে নামিয়ে দিয়ে ও পুরনো লক্ষ্ণৌয়ের বেগম বাজারের রাস্তা ধরেছে। সেখানে ইমতিয়াজ আখতারের ব্যবসা বাড়ি সবকিছু। মুসলমান প্রধান বেগম বাজার ঘিঞ্জি, রাস্তা সরু সরু, ভিড়ে ঠাসা। দুপুরে পথে পথে বোরখা পরা মহিলাদের আধিপত্য। মসজিদ পার হতেই একটা স্কোয়ার, এখানেই রাইট টার্ন নিতে বলেছিল দেশপাণ্ডের ইনফর্মার। হ্যাঁ, ঠিক জায়গায় এসেছে। ডানদিকে পরপর আখতার ব্রাদার্স অ্যান্ড সন্সের শো-রুম। হার্ডওয়্যার থেকে

With best compliments from: -

PIONEER PAPER CO.

(Quality Ex-Book Manufacturer with latest technology & Exporter)

REGD OFFICE & WORKS:

74, BELIAGHATA MAIN ROAD
KOLKATA-700 010
PHONE: 2370-4152, FAX: 91-33-2373-2596

Email: pioneerpaperco@gmail.com

Visit Our Website: - www.pioneerpaper.co

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

বেনারসী, সিল্ক, তাঁত শড়ীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রিয় গোপাল বিষয়ী ®

স্থাপিত - ১৮৬২

বড়বাজার ঃ ৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টী), কোলকাতা - ৭,

ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৪০২, ২২৬৮-২৮৩৩

২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭, ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৫০৮

গড়িয়াহাট ঃ ১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে,

কোলকাতা - ৭০০ ০২৯, ফোন ঃ ২৪৬৫-৮২৪৬

এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই

ফুটওয়্যার— কী নেই? জমজমাট শো-রুমস্। ইলেকট্রনিক শো-রুমে ইমতিয়াজকে পাওয়া গেল। মুফতিতে (সিভিল ড্রেস) থাকা অর্জুনকে কাস্টোমার ভেবে এক দীর্ঘাঙ্গ অত্যন্ত সুপুরুষ মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন— ফর্মাইয়ে ক্যা চাহতে হ্যায়?

অর্জুন পকেট থেকে আই কার্ড বের করে সামনে ধরে বলল— বিলকুল পার্সোন্যাল কাম সাব! ম্যায় ইমতিয়াজ আখতার সে মুলাকাত করনা চাহতা হুঁ। আই কার্ড দেখেই ঝুকে কুর্নিশ করে ভদ্রলোক বললেন— আদাব ডি এস পি সাহাব। ম্যায় হী ইমতিয়াজ আখতার হুঁ। আইয়ে মেরে সাথ।

শপের পেছনে গ্লাস প্যানেল সাজানো চেম্বারে এসে অর্জুনকে বসিয়ে নিজে বসলেন ব্যক্তিত্বময় চেহারার ইমতিয়াজ। ইন্টারকমে জলের ফরমাশ দিয়ে সোজা হয়ে দুহাতের আঙুল স্টেপল করে অর্জুনের চোখে চোখ রেখে বললেন— পুছিয়ে স্যার।

— শাজাদ আখতার আপকা বেটা হ্যায়?

— জী-জী। ঔর আপ মীনাক্ষী কী বড়ে ভাই হ্যায়! আপকা দর্দ সমঝ রহা হুঁ ম্যায় ডি এস পি সাব। বিতী হুয়ী কাল রাত উসকী মাতা-পিতা পর কিতনা ভারী পড়া হোগা ম্যায় সমঝতা হুঁ। একিন কিজিয়ে।

— ইসকা মতলব আপ জানতে থে কি আপকা বেটা মেরা বহন কো ইলোপ করকে লে যায়গা?

— জী নহী। য়ে সহি নহী, গলত বাত হ্যায়। ইলোপ নহী কীয়া, মীনাক্ষী অপনী মর্জিসে শাজাদ কে সাথ শাদী রচায়ী। বোহ্ দোনো মসজিদ সে ঘর আনে কে বাদ বেগম নে ফোন পর মুঝে বতায়া কাল শাম কো। য়্যাসা হরকৎ বচ্চে মা-বাপ কো বতা কর নহী করতে হ্যায় ডি এস পি সাব। হামারা ঘর নজদিক হ্যায়, খবর মিলতেহী ম্যায় ঘর পৌঁছা। মুঝে ডর লগা— লড়কী নাবালিক তো নহী? উস্নে মুঝে বার্থ সার্টিফিকেট আদী সবকুছ দিখায়া। ম্যায় নে উসকো আপলোগোঁ কো খবর দে দেনে কে লিয়ে সমঝায়া। বহোত আর্জি কীয়া, পরন্তু বোহ্ রাজী নহী হুয়ী।

— উসনে অপনা মোবাইল কালসে বন্ধ কর রখা হ্যায়। ক্যা আপ মুঝে উসসে একবার বাতেঁ করা সকতে হ্যায়?

— জী, জী। জরুর করা সক্‌তা হুঁ। ... ঘর বিলকুল পাস হ্যায়, আপ চাহেঁ তো ঘর চলিয়ে মেরে সাথ। আমনে-সামনে মিলনা ইস মুসিবৎ কা ঘড়ি মে জাদা জরুরত হ্যায়।

অর্জুন পুলিশি নজরে বুঝতে পারছিল ইমতিয়াজ মিথ্যে কথা বলছেন না। উনি জেনুইন শরীফ একজন মানুষ। ঝুট ঝামেলায় জড়ানো পছন্দ করছেন না। কিন্তু ছেলের জন্য বাধ্য হয়ে ওকে পুলিশের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাই প্রশ্ন করার আগেই স্বীকারোক্তি দিয়ে দিচ্ছেন। মিষ্টি আটঘাট বেঁধেই এসেছে, ওকে জোর করে তুলে আনেনি শাজাদ, এটা ধ্রুবতারার মতো সত্য। প্রেমের পাঁকে দুবছর যে মেয়ে ডুবে থাকতে পেরেছে নবাবী-র মতো জায়গায় সে অনেক দূর চলে গেছে। তাকে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। তবুও ওর সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়া দরকার। ওকে অর্জুন বুঝিয়ে দিয়ে যাবে যে ছোড়দা ওর কীর্তিকলাপ ক্ষমা করবে না।

অর্জুন ইমতিয়াজকে বলল— শুকরিয়া ইমতিয়াজ সাহাব, তো চলেঁ আপকা ঘর?

— হাঁ জী। চলিয়ে চলতে হ্যায়।

আটফুট পাঁচিল, স্টিলের পাতে মোড়া ভারী গেট, ভেতরে বড় বাড়ি। অর্জুনের মনে হলো ও যেন তিহার জেলে ঢুকছে, যদিও জানে বনেদি মুসলমান বাড়িগুলো এরকমই হয়। পর্দা অর্থাৎ মেয়েদের আব্রু বজায় রাখার জন্য। মিষ্টির মতো মুক্ত মেয়ে ইচ্ছেমতো এখান থেকে বাইরে যেতে পারবে না। অর্জুন বিরাট এক রুচিশীল ড্রইং রুমে বসেছিল। ইমতিয়াজ নিজের বেগম আরও কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সকলেই যেন এক এমব্যারাসিং মোমেন্টস্ পার করছেন মনে হলো ওদের দেখে। এবাড়িতে সম্ভবত প্রথম কোনো পুলিশের পা পড়েছে। একটু পরে মিষ্টি এলো শাজাদের হাতের মুঠোয় নিজের হাত মুষ্টিবদ্ধ করে। কপালে টিপ নেই, সিঁথিতে সিঁদুর নেই, শাড়ির আঁচলে মাথা ঢাকা মিষ্টিকে কেমন যে অদ্ভুদ লাগছিল অর্জুন বর্ণনা করতে পারবে না। শাজাদ যেমন মুঘল যুগের কোন শাহজাদা। বলিহারী পৌরুষ, নিয়মিত জিমে যাওয়ার প্রতীক। মিষ্টি রূপ সাগরে ডুবে মরেছে। মিষ্টি ওকে প্রণাম করল, শাজাদ নত হয়ে হাঁটু ছুঁয়ে কুর্নিশ করে বলল— আদাব ভাইজান। ওদের তিনজনকে রেখে অন্যরা অনুমতি গ্রাহ্য প্রস্থান করলেন।

মিষ্টিই প্রথম কথা বলল— আমি জানতাম ছোড়দা তুই আমাকে তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করে ফেলবি। সেজন্যই চিঠি লিখে রেখে আসিনি। কাল বিকেলে আমাদের বিয়ে হয়েছে। চারদিন আগে আমি ইসলামে কনভার্ট হয়েছি। মৌলবি আমার নামকরণ করেছেন শবনম। বুঝতেই পারছিস, আমি ওকে কতখানি ভালবাসি যে স্বেচ্ছায় মুসলমান হতেও আমার বাধেনি। জানি, আমি বাবা-মাকে বিট্রে করেছি, তোদের সকলের নজরে অপরাধী হয়ে গেছি, স্বার্থপরের মতো নিজের ইচ্ছের দাম দিতে গিয়ে। আমাকে সাজা দিতে চাস দে, কিন্তু শাজাদ আর আমার নতুন পরিবারকে হ্যারাস করিস না অকারণে। ওরা আমাকে ফুলসিয়ে আনেনি, আমি নিজে এসেছি শাজাদকে ভালবাসি বলে।

অর্জুনের জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। এ কোন মিষ্টিকে দেখছে ও? মিষ্টির পেটে পেটে এতো বুদ্ধি ছিল? প্রথমেই কথা বলে ওর মুখ বন্ধ করে দিল শুধু নয়, বুঝিয়ে দিল যে লিগ্যাল কনটেস্ট করতে গেলে তোরা কাদায় পড়ে যাবি ছোড়দা। আমিই তোদের হারিয়ে দেব। এখানে এসে ও ভুলই করেছে। প্রাণের কাছের ছোট বোন ঝানু উকিলের মতো ওর মুখ খোলার সুযোগই দিল না। বিতৃষ্ণায় ভরে গেল অর্জুনের মন। মান বাঁচানোর জন্য বলল— আমি এখানে কাউকে হ্যারাস করতে তো আসিনি। পুলিশ অফিসার হিসেবে মিসিং কেসের ক্লু খুঁজে পেয়ে ইনভেস্টিগেট করতে ইমতিয়াজ আখতারের কাছে এসেছিলাম। চমৎকার ভদ্রলোক, কো-অপারেট করেছেন। যা জানার ছিল সবই জেনেছি। উনিই আমাকে এখানে আসার অনুরোধ করেন, আমি তোকে দেখব বলে, কথা বলব বলে অ্যাকসেপ্ট করেছি। ইনফ্যাক্ট নবাবীতে যাওয়ার পরই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তোর মোটিভ। হ্যারাস করতে এলে ইউনিফর্মে থাকতাম, সঙ্গে ফোর্স নিয়ে আসতাম। শাজাদ, আপনা আব্বু কো বুলাইয়ে। ম্যায় উনসে বিদা কহনা চাহতা হুঁ।

শাজাদ অনুনয় করে বলল— ভাইজান আপ ইনকো মুয়াফ (ক্ষমা) কর দিজিয়ে। সি ইজ ইন স্ট্রেস।

অর্জুন স্মিত মুখে বলল— আই আন্ডারস্ট্যান্ড। আই অ্যাম অলসো ইন স্ট্রেস শাজাদ। কল রাত সে অব তক না কুছ খায়া না নাহায়া। টাইম নহী মিলা নাহানে-খানে কে লিয়ে। ঘর কা বেটি যব দের রাত তক্ ঘর নহী লৌটতি তব ভাই ক্যাসে নাহায়ে, ক্যাসে খায়ে, ক্যাসে শোয়ে বতাইয়ে? যাইয়ে ইমতিয়াজ সব কো বুলাইয়ে।

স্নান করে ওখানে খেয়ে নেবার জন্য ইমতিয়াজের সবিনয় অনুরোধ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে অর্জুন গেট পেরিয়ে গাড়িতে উঠল।

জীবনের মূল মন্ত্রই সহনশীলতা। যে যত সহ্য করতে পারে সে তত বেঁচে থাকে। বিয়ের আগে বাবা একথা বলেছিল শর্মিকে। ছোট পিসি-পিসেমশাইও বেঁচে আছেন, তবে এই বাঁচা না বাঁচার মতোই। মনের ভেতর সারাক্ষণ জ্বলতে থাকা চিতার আগুনে পুড়ছেন ওরা। বর্তমানে ওদের একমাত্র সহায় শর্মি নানা ভাবে জল ঢেলেও আগুন নেভাতে পারে না। ওর নিজের মনেও কষ্ট আছে। প্রিয় ননদ বন্ধু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বৌদির বন্ধুত্বকেও সে অবিশ্বাস করেছে, একথা মনে হলেই শর্মির কষ্ট হয়। এক বছর হয়ে গেছে মিষ্টি চলে গেছে, আর দেখা হয়নি, কোনো খবর পাবার উপায়ও নেই। তবু মেয়েটা ওর মনে বাসা বেঁধে বসে আছে। ও ছিল বলেই শর্মি লক্ষ্ণৌয়ের পথঘাট চিনেছে, এই শহরের প্রাত্যহিক জীবনে অভ্যস্ত হতে পেরেছে— কী করে ভুলবে মিষ্টির অবদান? বাজারহাট করতে বের হলেও ও মিষ্টিকে খোঁজে। বোরখা ছাড়াদের দেখে, বোরখা পরাদের হিজাবের এক চিলতে ফাঁকে দুটো চোখ দেখে। কত প্রশ্ন জাগে মনে— মিষ্টি কি সেই ভারী গেটের বাইরে আসতে পারে? ওকে বোরখা পরে বের হতে হয়? নমাজ পড়তে হয়? ও কি নিজেকে সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে মানিয়ে নিতে পেরেছে? যার জন্য স্বজনহারা হলো সে কি ওর সব অভাব মেটাতে পেরেছে? মিষ্টি সুখী হয়েছে ওর মতো?— এসব প্রশ্ন হয়তো ছোট পিসির মনেও অনুক্ষণ ঘোরাফেরা করে। কোনো উত্তর পায় না বলে পিসি দিনেদিনে নিরুদ্যম হয়ে গেছে। একটা ঝড় পিসির সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে। ঘরের বাইরে যেতেই চায় না। একবারও মিষ্টির নাম উচ্চারণ করে না। সারাদিন পিসেমশাইয়ের সেবাযত্নে আর কাজের মধ্যে মগ্ন থাকে। শর্মি একদিন বাপ্পাকে জিজ্ঞেস করেছিল— দাদা, তুমি তো বলেছিলে সবাই ছেড়ে দিলে তুমি যোগাযোগ রাখবে। বল না দাদা, মিষ্টির সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার? একই শহরে থেকে কেন ওর খবর রাখবে না তোমরা?

দাদা বলেছিল বিষণ্ণ গলায়— দেখা হয়নি রে! চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু প্রথমবারই ও দেখা করতে রাজি হয়নি। একটা লোককে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল আর যেন না যাই। গেট থেকেই ফিরে এসেছি। আমরা ওকে ত্যাগ করব কী, ও নিজেই আমাদের ত্যাগ করেছে শর্মি। অর্জুনের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করেছে, আমাকে দরজা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে, কী যে হয়েছে ওর বুঝতে পারছি না।

— তুমি কবে গিয়েছিলে?

— অনেকদিন আগে। ও চলে যাবার মাস দুয়েকের মধ্যেই।

শর্মিও বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। গত এক বছরে ও তিনবার শ্বশুরবাড়ি বাপেরবাড়ি ঘুরে এসেছে, আর মিষ্টিকে দেখতে গেলে ও দাদাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে সম্পর্কটাকে জুড়তেই দিচ্ছে না? কেন?

শাজাদ শাজাদ আর শাজাদ! শাজাদ ছাড়া আমার জীবনে অন্য কোনো ভুবন ছিল না। ওকে বিয়ে করে কোনো অন্যায়

করিনি আমি। রূপে গুণে শিক্ষায় সম্পদে ওর মতো পাত্র কেউ ধরে আনতে পারত না আমার জন্য। ওর মতো ছেলের পরিবারের প্রচুর দাবি থাকতোই, যা আমাদের মতো পরিবারের পক্ষে মেটানো অসাধ্য। আমার বাড়ির কেউ এই ভাল দিকটা দেখছে না। শাজাদ মুসলমান, এটাই ওদের হিন্দুত্বের অহংকারে আঘাত করছে। জ্ঞান হওয়া থেকে মুসলমানদের সঙ্গে বড় হয়েছি আমি, বাড়িতে দুপুর হলেই প্রতিবেশী মুসলিম মহিলাদের মা-র সঙ্গে মজলিশ হতে দেখেছি। আমার ওদের কখনো আলাদা কোনো জীব বলে মনে হয়নি। ওরা আমাদের মতোই মধ্যবিত্ত মানসিকতা নিয়ে বেঁচে থাকা সাধারণ মানুষ। কচিৎ কখনো বিশেষ কোথাও যাবার হলে বোরখা ব্যবহার করত, তা না হলে বোরখার আড়ালে থাকতে দেখিনি। বড়জোর রাস্তায় বের হলে বিবাহিতরা মাথায় আঁচল বা দোপাট্টা টেনে দিত। মেয়েরা তাও করত না। ওদের মেয়ে-বৌরা আমাদের মতোই স্বাধীনতা ভোগ করেছে। মুসলমানত্ব যদি থেকেও থাকে তাহলে ভেতরে ভেতরেই থেকেছে, বাইরে প্রকাশ করতে দেখিনি কট্টরবাদ। পরস্পর বিরোধী দুটো কমিউনিটিই দাঙ্গা-ফাসাদ ভয়ঙ্কর অপছন্দ করত। পিসফুল কো এক্সিস্ট্যান্স চাইত মনে মনে, তাই আমরা ঐ পাড়ায় মাইনরিটি হয়েও তিনপুরুষ একনাগাড়ে শান্তিতে থাকতে পেরেছি। মুসলমান মানেই হিন্দুবিদ্বেষী— একথায় আমার বিশ্বাস নেই। তা না হলে আমাদের ছাদের ওপর পাশের বাড়ির সঙ্গে ক্যাটওয়ে বানাবার অনুমতি দিত না ওরা। হিন্দু প্রতিবেশীর নিরাপত্তার কথা ভেবেই দিয়েছিল। শাজাদকে আমি কখনো হিন্দু-মুসলমানের দাড়িপাল্লায় ওজন করিনি। বলতে বাধা নেই, প্রথমে ওর রূপেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তখন আমার বয়স সাড়ে একুশ বছর। বন্ধু সাইদার শাদীতে পরিচয়। পরে আস্তে আস্তে ওর ভেতরের গুণে মুগ্ধ হয়ে গভীর ভালবাসায় পরম বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরেছি। শাজাদ বলেছিল, ওদের জয়েন্ট ফ্যামিলি, বাবারা চার ভাই, একসঙ্গে থাকেন। ওর বড় ভাইরা সবাই বিদেশে সেটল্ করেছে। জ্যাঠা-বাবাদের বয়স বাড়ছে, এখানে ব্যবসা সামলানোর জন্য ও আর ওর খুড়তুতো ভাই আজাদ এখানেই থাকবে বলে ডিসিশন নিয়েছে। দুই ভাই-ই বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পাশ করে নিজেদের পৈত্রিক ব্যবসায় লেগে পড়েছে। আমি শাজাদের বাড়ির কাউকে চিনতাম না। বেগম বাজারে বাড়ি এটুকু জানতাম শুধু। আমরা দুজনেই নিজেদের বৃত্ত ভেঙ্গে একে অন্যকে ভালবেসেছি। এখন সময় এসেছে প্রেমকে পরিণয়ের মর্যাদা দেবার। বৃত্তের বাইরে অনির্দিষ্টকালের অপেক্ষায় 'মেটেওর' হয়ে আর কতকাল শূন্যে ঝুলে থাকব আমরা? দুটো বৃত্তের যে কোনো একটাতে আমাদের ঢুকে পড়তে হবেই। সংসার পরিবার গড়ে আমাদের অস্তিত্ব প্রবহমান করে রেখে যেতে হবে। শাজাদকে আমার বৃত্তে এসে ঢোকার কথা বলে এমব্যারাস করতে পারব না। আমি জানি, অরিজিন্যাল মুসলিম অর্থাৎ যারা মুঘল সম্রাটদের সঙ্গে এসেছিল তারা মাথাটা কেটে দিয়ে দেবে, তবুও ধর্ম পরিবর্তন করবে না। মুহব্বতের জন্যও না, প্রাণ বাঁচানোর জন্যও না। আমাকেই ওর বৃত্তে প্রবেশ করতে হবে। যুগ যুগ ধরে সারা পৃথিবী জুড়ে কখনও সাম্রাজ্যবাদের কারণে কখনও নিজের দেশেই উচ্চবর্ণের মানুষের অকথ্য নির্যাতনে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুসলমান-খ্রিস্টান হয়েছে। আর প্রেমের বেলায় তো কথাই নেই। নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি, শাজাদের কাছে বারবার সময় চেয়েছি, তারপর একদিন মন স্থির হয়ে গেছে। কী করে কনভার্ট হব শাদী করব সব প্ল্যান আমি নিজে করেছি, শাজাদ শুধু সঙ্গে থেকেছে। কোথা থেকে যে এতো শক্তি পেয়েছিলাম জানি না। সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পেরেছি শেষ মুহূর্ত অবধি।

শাজাদের হাত ধরে এক কাপড়ে যখন এবাড়িতে গৃহপ্রবেশ করলাম তখন বরণডালা নিয়ে কেউ আমাকে বরণ করেনি। ওদের এসব নেই। পুরুষরা বাড়ি ছিল না, শুধু মেয়েরাই ছিলেন তখন। তাদের চোখে মুখে ভয় অস্বস্তি, ব্যবহারে আড়ষ্টতা নজরে পড়েছে। এমন একটা অকল্পনীয় ঘটনার আকস্মিক আঘাতে তাদের সকলের মুখই শুকিয়ে গিয়েছিল। ওদের বিশাল ড্রইংরুমে এবাড়ির নতুন বৌ আমি ধর্মান্তরিত বেগম শবনম আখতার একা বসেছিলাম। শাজাদকে ওরা ভেতরে নিয়ে গিয়েছিলেন, হয়তো ওর জেরা চলছিল অন্দরমহলে। কিছুক্ষণ পর বাইরে থেকে পুরুষরা একে একে আসতে লাগলেন। সকলেই আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ভেতর বাড়িতে চলে গেলেন। বুঝতেই পারছিলাম ওরা খবর পেয়ে কাজকর্ম ছেড়ে চলে এসেছেন। অনাহুত হয়ে আমার এবাড়িতে এসে পড়া ওদের খুশির কারণ নয়, অশনিসংকেত। পরিবারের তরফ থেকে বিন্দুমাত্র সমাদর না পেয়ে ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠেছিল তখন। অনেকদিন আগে শাজাদ বলেছিল ওর আম্মি-আব্বুর আপত্তি নেই। তাহলে কী ওরা পরে মত পাল্টেছেন? নাকি তখনকার মতো বয়সের ধর্ম মনে করে ছেলেকে স্তোকবাক্য শুনিয়ে ভেবেছিলেন এসব মিটে যাবে?— এখন যদি ওরা আমাকে গ্রহণ না করে তাহলে কি করব আমি? কোথায় যাবো? শাজাদ কি পরিবার ছেড়ে আমাকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে? গলা শুকিয়ে গেছে, জল তেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু কেউ নেই যে জল চাইব। এদের প্রথা মতো শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে কেউ এলে জল, শরবত দেবেই। আমাকে একগ্লাস

জল পাঠায়নি। ভিখারির মতো প্রত্যাশী হয়ে বসে বসে এতদিন ধরে সঞ্চয় করা মানসিক শক্তিতে ধস নামছিল। অবসন্ন শরীর-মন, ব্যর্থ আত্মসম্মান, প্রবল ইনসিকিউরিটি চোখের জল হয়ে নামতে শুরু করেছে তখন। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবে ভেবে অভিমানে যেই উঠতে যাবো তখনই এক দীর্ঘদেহ বয়স্ক পুরুষ এসে ঢুকলেন ঘরে। ওর পেছনে পুরো পরিবারের মহিলা-পুরুষ আর শাজাদ। বয়স্ক পাকা চুল পাকা দাড়ি মানুষটি আমার সামনে এসে বললেন— বেটা আপকো বহোত দের অকেলে বৈঠনা পড়া, ইস লিয়ে হমলোগ শর্মিন্দা হ্যায়। বুরা লগা হোগা আপকো। লেকিন আপ দোনো নে মামলা হী য়্যাসা উলঝ দিয়ে কী ইসকো সুলঝনে মে থোড়ী সী বক্ত বিত গয়া। ম্যায় শাজাদ কা বড়ে আব্বু অর্থাৎ তাউজী হুঁ। আইয়ে দুলহন বেগম য়্যে ঘর আপকো সোয়াগৎ করতা হ্যায়। — কৃতজ্ঞতায় বজ্রাসনে মাটিতে বসে মাথা ওঁর পায়ের ওপর রেখে প্রণাম করেছিলাম। একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন বড়ে আব্বু। অবশেষে স্বীকৃতি পেয়ে ধন্য হলাম আমি।

সবই ঠিক মনে হচ্ছিল। ওরা আমাকে অনাদর করেনি। শাজাদের মা আমাকে ভালবাসতেন। আমি নতুন পরিবেশে এসেছি, নতুন ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি, মানিয়ে নিতে সময় লাগবে বুঝতেন তিনি। কিন্তু অন্যরা সমঝদার ছিল না ওনার মতো। ওরা কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে পাক্কা মুসলমানি বানিয়ে ফেলার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতেন। কালীবাড়ির পাড়ায় বড় হয়েছি, আসতে যেতে মা কালীকে প্রণাম করার অভ্যাস ছোট বেলা থেকে। মনের মধ্যে সেই বিশ্বাস চোখে সেই মূর্তিই যে ভাসে। তাঁকে কি সহজে মুছে ফেলা সম্ভব? পরিবার ত্যাগ করেছি, পরিবারের ভালোর জন্য, ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে ওদেরই খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হতো। তাই বলে কী ওরা আমার মন থেকে সত্তা থেকে মুছে যাবে? কখনো না। মা কালীও আমার সত্ত্বার মধ্যেই আছেন, আমার পার্সে তাঁর ছবি রাখি, মুসলমান হয়েছি বলে আরাধ্য দেবী মাকে অস্বীকার করার ইচ্ছেই আমার নেই। বাইশ দিন হয়েছে ভারী গেটটা পেরিয়ে এবাড়িতে ঢুকেছি, আর বাইরে যাওয়া হয়নি। পুরুষরা সকাল দশটায় হেভি নাস্তা করে শপগুলোতে চলে যায়, আর রাত দশটায় ঘরে ফেরে। দুপুরের খানা, বিকেলের নাস্তা বান্দাগুলো শপে পৌঁছে দিয়ে আসে। তাই শাজাদের সঙ্গে রাতের আগে দেখা হয় না। ছোটি চাচি বলেছেন, দিনের বেলা শাজাদের সঙ্গে সকলের সামনে যেন কথা না বলি। অসভ্যতা করা হয় এতে। তারপর— হিন্দুদের মতো মাথায় ঘোমটা দেওয়া চলবে না, ওটা রীতি নয়। আমার আঁচল বা দোপট্টায় কপাল ঢেকে কানের পেছন দিয়ে নিয়ে টাইট করে সেফটিপিন আটকে দেন তিনি। আয়নায় নিজেকে কী বিশ্রি যে লাগে তাকাতে ইচ্ছে করে না। অতো বড় বাড়িটাতে ছাদ ছাড়া খোলা জায়গা নেই, বারান্দা নেই। পর্যাপ্ত আলো-বাতাস আসার পথ বন্ধ। প্রত্যেক কামরায় একটা করে মাত্র সিঙ্গল পাল্লা জানালা, তাও বন্ধ রাখতে হবে, তা না হলে আব্রু বজায় থাকবে না। কতদিন আকাশ দেখিনি, বাইরের দুনিয়া দেখিনি। হাঁপিয়ে উঠে একদিন ছাদে চলে গিয়েছিলাম। সেপটিপিন খুলে মাথার বাঁধন নামিয়ে একটু মুক্তির স্বাদ নিতে না নিতেই ছোটি চাচি চলে এসে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করে নামিয়ে আনলেন। সেদিন নিজের কামরায় এসে প্রথম কেঁদেছিলাম। সেই থেকে শাজাদের চোখের আড়ালে কান্নার শুরুয়াত। বুঝতে পেরেছিলাম, এবাড়ির পুরুষরা আমদানি করতে ব্যস্ত থাকে, অন্তরালে থেকে মহিলারা মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্য চালায়। একদিন শুনলাম, তাইজী আমার শাশুড়িকে বলছেন— একমাস হতে চলল, কই তুমি তো শবনমকে নমাজ পড়ার জন্য ডাকো না? ওকে তো এসব শিখতে হবে। মৌলভী রেখে কোরান শরীফ, হাদিশ, শরিয়ত পড়া শেখাতে হবে, তা না হলে ও সম্পূর্ণ মুসলমানী হবে কী করে? তোমাকে শক্ত হতে হবে নাজিয়া বেগম। ও তোমার ছেলের বৌ, নামে মুসলমান মনে হিন্দু হয়ে কি ও আমাদের খানদানের বংশধরের জন্ম দেবে? পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ না করুক, অন্তত সকাল-সন্ধ্যা ফজর-ঈশার নমাজ আদা তো করবে?

পরদিন সকাল সাড়ে পাঁচটায় দরজায় নক্ করে শাশুড়ি আমাকে ডেকে তুলে বললেন— জলদি কাপড়া বদলে অজু করে এসো। পরিষ্কার হয়ে এসে শাশুড়ির পেতে রাখা জায়নাসাজে বসলাম। তিনি বলেন আমি অনুকরণ করে বলি— আল্লাহ্ দিন ইলল্লাহ্ রসুলাল্লা আল্লাহ্ হো আকবর...। মুখের সামনে মেলেরাখা জোড়া হাতের পাতায় মা কালীর মূর্তি ফুটে উঠে মাটিতে মাথা নোওয়ানোর সময় মহাদেবের বুকের ওপর মাকালীর ডান পা দেখি। নিরাকার কিছু কল্পনা করা যায় না।

আঠাশ দিনের দিন শুক্রবার ছিল। শাজাদ বলল— মীনাক্ষী, আজ বিকালে আমরা বাইরে যাবো। দুদিনের চেঞ্জ ওভার ছোট ব্যাগে ভরে তৈরি থেকো। আমি জানি তুমি চার দেওয়ালের ভেতর বন্ধ হয়ে কষ্ট পাচ্ছো। কিন্তু মুখ ফুটে বলছ না। শুক্রবার বিকেল থেকে রবিবার বিকেল আমরা আগের মতো কাটাবো। ইচ্ছে থাকলেও এবাড়ির কঠোর অনুশাসন ভেঙ্গে ঘন ঘন তোমাকে নিয়ে কোথাও যেতে পারি না বলে আমারও দুঃখ হয়। তবে মাসে একবার অন্তত যাবার চেষ্টা করব।

অভিমানের কান্না চাপতে পারিনি। চোখভরা জল নিয়ে বলেছি— আমি ঠিক আছি শাজাদ। — যদিও মন জানে আমি

ঠিক ছিলাম না। আমার ভেতরে এই ক'দিনেই হতাশার হা-হুতাশ বাসা বেঁধেছে। এবাড়ির রিচ খাবার আমার সহ্য হচ্ছে না। ঘি চপচপে পরোটা-রুটি রোজ বিরিয়ানি— গোস্ত আর খেতে পারছি না। মার হাতের ডালভাত, শুক্তো, মাছের ঝোল খাবার জন্য প্রাণ আইঢাই করছে, কিন্তু সেই পথ আমিই বন্ধ করেছি। তার উপর দুনিয়ার সঙ্গে কাট-অফ্ হয়ে গিয়ে বেঁচে থাকাই নিরর্থক মনে হচ্ছে এখন। আজ বাইরে যেতে পারব শুনেও খুব আনন্দ হয়নি। এ যেন দুদিনের জন্য জেল থেকে পেরোলে বাইরে যাওয়া।

বিকেলে সাজগোজ করে তৈরি হয়ে শাজাদের জন্য অপেক্ষা করছি, ও এক্ষুনি এসে পড়বে। ছোটি চাচি এলেন আমার ঘরে। হাতে কালো বোরখা-হিজাব। বললেন— বেটা এসো। হিজাবটা বেঁধে দিই আগে। তুমি কোনোদিন এসব পরোনি, নিজে বাঁধতে পারবে না। মুখ দিয়ে কী করে যে বেরিয়ে গেল— এসব কি পরতেই হবে? চাচি অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে বাকরহিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন একটুক্ষণ, তারপর ধারালো গলায় বললেন— 'জরুর পরতে হবে, এই খানদানের বহু হয়ে থাকতে হলে। সাধারণ ঘরের হিন্দু মেয়ে ছিলে, মুসলমান খানদানের আব্রু ইজ্জত কী তুমি বুঝবে? বেশি কথা না বলে আদেশ মেনে চল।' — অপমান বোধ আছে আমার, কিন্তু প্রতিবাদের সাহস নেই, তাই নীরবে মাথা এগিয়ে দিলাম।

শাজাদ বাইক চালাতে ভালবাসে। আজ দেখি গ্যারেজে ঢুকে ওর স্যানট্রো গাড়ির দরজা খুলল। আমাদের শাদীর দিন প্রথম এই গাড়িতে চড়িয়ে মৌলবীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল, সেদিন জেনেছি ওর নিজের একটা গাড়ি আছে। আমি বসতেই বলল— এই বোরখা হিজাব খোলো।

অবাক হয়ে বললাম— কেন? চাচিজান নিজে পরিয়ে দিয়েছেন যে?

— উনি ওনার কাজ করেছেন, আমি আমার কাজ করছি। বোরখা পায়ের তলা দিয়ে টেনে বের করে ফেল। হিজাব আমি

খুলে দিচ্ছি। আমরা আগের মতো বাইকে যাবো হাওয়ায়, খোলা আকাশের নীচে দিয়ে। এগুলো গাড়িতে থাকবে। ভয় পেয়ো না, কেউ দেখতে পাবে না। বারান্দা নেই। জানালা নেই, কোত্থেকে দেখবে? এসে আবার এখানেই পরে ফেলো।

সারা লক্ষ্মৌ সিটি ঘুরে বেড়ালাম খুল্লামখুল্লা। সমস্ত মানসিক চাপ, অবসাদ, দুঃখ সব নিমেষে চলে গেল। নতুন করে যেন প্রাণ ফিরে এলো। শাজাদ বলল— এখন লক্ষ্মৌ থেকে আমরা আগ্রায় যাবো মুমতাজ মহলে। পূর্ণিমার রাতে তাজমহলে বসে থাকব। হোটেল বুক করে রেখেছি।

উফ্! মুক্তি মুক্তি মুক্তি! আগ্রায় 'বাঙালি বৌদির রান্না ঘর' যে বিশুদ্ধ বাঙালি থালি খেলাম নিকানো মাটির ঘরে আসনে বসে। কী তৃপ্তি বলে বোঝানো যাবে না। ভরা পূর্ণিমায় তাজমহলে শাজাদের কোলে মাথা রেখে চুপ করে শুয়ে থেকেছি। মাত্র দু'দিনের হানিমুনে অপার শান্তি নিয়ে ফিরে এসেছিলাম।

এবাড়ির পুরুষরা সকলেই যথেষ্ট উদার, কট্টর ইসলামিয়ত তাদের মধ্যে দেখিনি এই এক বছরে। হয়তো ওদের কলেজ এডুকেশন আছে বলেই সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে উদার হতে পেরেছে। আমাকে কোরান-টোরান পড়াবার জন্য মৌলবী রেখে দেবার প্রস্তাবকে বড়ে আব্বু আর আব্বুজান পাত্তা দেননি। বড়ে আব্বু নিজের বেগম অর্থাৎ তাইজানকে তিরস্কার করে বলেছেন— কোরান না পড়তে পারলে গুনাহ্ হয় না, কিসিকা দিল দুখানে সে গুনাহ্ হোতা হ্যায়। জবরদস্তী মৎ করিয়ে বেগম, ইনকো জিনে দিজীয়ে। বিটিয়ানে জো কদম উঠায়া হ্যায় বো কাবিলে তারিফ, শাজাদ কো পানে কে লিয়ে। উনহোনে ক্যা ক্যা ছোড়া হ্যায় আপ নহী সমঝেঙ্গে। উনকো তং মত্ করিয়ে, ইজ্জত করনা শিখিয়ে। বো পড়ী-লিখি হ্যায়, যব মর্জি হোগা আংরেজী মে লিখাহুয়া কোরান-হাদীশ সব পড় লেগী। আপ ইস আর্জিকো মেরে সামনে দুবারা দোহরানা নহী।

কার্পেটের ওপর বসে জলচৌকি সমান উঁচু লম্বা টেবিল ছ'জন পুরুষ একসঙ্গে রাতের খাবার খাচ্ছিল। সকলের, বিশেষ করে আমার সামনে অপদস্থ হয়ে তাইজান যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবেন বুঝতে পেরেছিলাম। তাই সতর্ক থাকতাম। অন্তঃপুরে নিজের শাশুড়ির জমি বিশেষ নেই, তিনি অন্যদের কাছে নত হয়েই থাকেন। মাঝলী চাচিও নরমই। বড় আর ছোটোর দাপট সহ্য করা খুবই কষ্টকর হতো। গতবছর রমজানের ক'দিন পর শাদী করেছিলাম আমরা। আবার রমজান মাস এসে পড়েছে। আমার বুক কাঁপছে। আমি উপোশ করতে পারি না, মাথা ঘোরে, বমি হয় উপবাসী থাকলে। এখন রোজা তো রাখতে হবেই। জল তো দূরের কথা, থুতুও গেলা বারণ সারাদিন। শাশুড়ি আমাকে শুধু সকালের 'ফজর' নমাজ করাতেন, পরে ছোটি চাচি সন্ধে বেলা 'ঈশা'র নমাজ করাতে লাগলেন। এখন রমজানের আগে তাইজান আদেশ করেছেন জোহর, আসার, মাহগ্রীব অর্থাৎ পাঁচবারের নমাজ করতে হবে আমাকে। ইদানীং ওদের সঙ্গে আমাকে শপিং করতে নিয়ে যান ওরা। মাথা থেকে মাটিতে লুটোনো বোরখা, হিজাবে শুধু চোখ দুটো খোলার মতো দুটো স্লিট। দেখতে পাই না ভাল করে, তবুও মুখ বুজে পরে যাই। অভ্যেস করতে তো হবেই।

শাজাদ লুকিয়ে ড্রাই ফ্রুটস আর জল খাওয়াতো বলে রোজা কোনোমতে পার করেছি। ও আছে পাশে, তাই আমি টিকে আছি। তা না হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া বাঁচার অন্য পথ থাকত না। শুনেছি বখরীদে নাকি ওদের বাড়িতে সবচেয়ে দামি গোস্ত রান্না হয়, সেটা হলো উটের মাংস। বীফ সব চেয়ে সস্তা। এবাড়ির প্রত্যেক দিনের মেনুতে ল্যাম্ব আর চিকেন থাকে, বিয়ের নিমন্ত্রণে গেলে বীফ খায়। এছাড়া গো-মাংসে রুচি নেই। মাছ খায়, কিন্তু এটাও প্রচুর রসুন বাটায় রগরগে থাকে। আস্তে আস্তে সবই সয়ে যাচ্ছে তবে বীফ আমি কিছুতেই খাবো না। বাড়ির পুরুষরা মেয়েদের ব্যাপারে মোটেই ইনভল্ভ হন না দেখেছি, আমিও শাজাদের কাছে কখনও কিছু বলি না। নিজেই অনেক কিছু আন্দাজ করে নেয়, সাহায্যও করে। তাইজান সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এবার বখরি-ঈদে উট নয়, গোরুর মাংস হবে। উটের দাম নাগালের বাইরে চলে গেছে। কেউ আপত্তি করেনি এই সিদ্ধান্তে। কারণ সেদিন কমপক্ষে পঞ্চাশ জন গেস্টও খাবে। বড়ী বেগম ন্যায্য কথাই বলেছেন।

বখরি-ঈদের দুদিন আগে নাকি একটি স্বাস্থ্যবান গোরু কিনে আনা হয়েছে। আমার কামরা সাফ-সাফাই যে করে সেই বাঁদি উল্লসিত হয়ে জানালো, বাড়িতেই জবাই হবে। ও বলল— ঐ সময় উপস্থিত থেকে 'হালাল' দর্শন করলে নাকি পুণ্য হয়। জিন্নতে যাওয়া যায়। আমার তো শুনেই জী-ঘাবড়াতে (শরীর খারাপ) লাগল। অতো বড় প্রাণীর গলার নলি কেটে দীর্ঘক্ষণ ধরে হাত-পা ছুঁড়ে অসহায় চোখে তাকিয়ে থেকে শেষ রক্তবিন্দু বেরিয়ে যাওয়ার বীভৎস দৃশ্য কল্পনা করতে শরীর কাঁপছিল। এই নৃশংসতা দেখে জিন্নত স্বর্গ কোথাও যেতে চাই না আমি।

ঈদের দিন দুপুরের দাওয়াতে খেতে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত,

শপগুলোর মুসলমান সেলস্‌ম্যানরাই এসেছে বেশি। অতিথি আপ্যায়নের পর আমাদের খাওয়ার পালা। আগের দিন থেকে পেট খারাপের অজুহাত দিয়ে রেখেছি। লিকুইড পান করছি। বিছানায় শুয়ে রয়েছি, তাতেও রক্ষা হলো না। দুপুর আড়াইটে নাগাদ তাইজান আর ছোটি চাচী আমার কামরায় এলেন। হাতের বর্তনে বিরিয়ানি-মাংস। — শবনম বেগম উঠিয়ে। বখরীদির কোরবানির দিন আজ। আজ কেউ না খেয়ে থাকে না। খানা খেয়ে নাও। কোরবান করা গোস্ত খেতেই হয়। বিনয়ের সঙ্গেই বললাম— কেন এখানে খানা নিয়ে আসার তকলিফ করলেন? আমার কাল থেকে পেট খারাপ, লস্যি খাচ্ছি। বিরিয়ানি-গোস্ত খেলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ব তাইজান।

ছোটি চাচী রুক্ষ স্বরে বললেন— তোমার বাহানাবাজি বুঝি না ভেবেছ? বড়ী বী (দিদি), আমি ওকে মুখ খোলাচ্ছি, আপনি মুখে গোস্ত ঠুসে দিন তো!— ছোটি চাচী আমার দুই গাল এমন টিপে ধরলেন যে ব্যথায় কাঁকিয়ে উঠে অস্পষ্ট শব্দে আঃ লাগছে বলার চেষ্টা করতেই তাইজান মুখে চামচ ঢুকিয়ে চাপ দিলেন। জিভে, দাঁতে, ঠাকরায় যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে আমার মুখে একপিস গোরুর মাংস ঢুকিয়ে দিল, তারপর গায়ের জোরে চোয়াল চেপে মুখ বন্ধ করে রাখল কিছুক্ষণ। চাচী বলল— নখড়া না করলে জবরদস্তী করতাম না। তোমাকে কী করে পুরোপুরি মুসলমান করতে হয় সে আমরা দেখাব। এখন ঢং রেখে উঠে বসে খাবার খাও। সেই তো গোরুর গোস্ত খেলেই, আর আপত্তি কীসে? চলুন বড়ী বী।

সেই দুপুরে আমি বদলে গেলাম। ভালো মেয়ে মিষ্টির মধ্যে মুসলমানি শবনম বেগমের জিঘাংসা জেগে উঠল। এক বিন্দু চোখের জল ফেলিনি, এক কঠোর সংকল্পে অটল হয়ে বাথরুমে ঢুকে মুখে গুঁজে রাখা মাংসের টুকরো কমোডে ফেলে ফ্লাশ করে ভাল করে কুলি করলাম। ব্রাশ করে আবার গলা অব্দি কুলি। শাওয়ারের নীচে স্নান করলাম। আয়নায় দেখলাম ফর্সা দুই গালে পিশাচ সায়রা বেগমের আঙুলের দাগ লাল হয়ে স্বাক্ষর রেখেছে। শাজাদ নীচে অতিথিদের সঙ্গে। এমনিতেও দিনের বেলা সকলের সামনে দিয়ে ওপরে নিজের কামরায় খুব কমই আসে ও। চেস্ট অফ ড্রায়ারে সাদা কাগজের ডিফারেন্ট সাইজের বান্ডিল রাখে শাজাদ, সেখান থেকে কাগজ কলম কারেকশন পেন বের করে দরজা বন্ধ করে শাজাদের লেখার টেবিলে বসেছি এক বছরের দিন যাপনের দলিল লিখব বলে। ভেতরের আগুন শাজাদের ভালবাসায় নিভে যাবার আগেই যতটা পারি লিখব। যে শক্তি হারিয়ে গিয়েছিল সেই শক্তি আজকের ঘটনা ফেরত এনে দিয়েছে। ইসলামে কনভার্ট হবার আগেও ঠিক এমনই মানসিক শক্তি অনুপ্রেরণা দিয়েছিল আমাকে। তখনকার মতোই আজ আবার মন শান্ত আছে, স্থির হয়ে গেছে আগত দিনের কাজ। এবাড়ির বড়ী বেগম মুনয়ারা আর ছোটি বেগম সায়রা আর আমাকে নির্যাতন করতে পারবে না।

মা বাড়িতে আমাদের ভাই-বোনকে বাংলা ভাষায় লিখতে পড়তে শিখিয়েছিল দাদু-দিদাকে চিঠি লেখার জন্য। এখন তেমন চর্চাও নেই, তবুও বাংলাতেই আমার এক বছরের ইতিকথা খুব সংক্ষেপে লিখব, যাতে এবাড়ির কেউ পড়তে না পারে, এমনকি শাজাদও না। এই লেখাই আমার অস্ত্র হয়ে ভবিষ্যতে তাইজান-ছোটি চাচীর ঘাড়ে কোপ মারবে। লেখা শেষ হলেই অ্যাকশন হবে।

মাত্র ৪-৫ পাতা লিখতে এক সপ্তাহ লেগে গেল অনভ্যাসের দোষে। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে লেখার জন্যও। শাশুড়ি মার কাছে আধঘণ্টার জন্য বেগম বাজারে একা যাওয়ার অনুনয় করতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিলেন। পোস্ট অফিসে বসে লেখাটা আবার পড়লাম। এনভেলাপে ঢোকানোর আগে এই শেষ কথাগুলো লিখলাম।

অর্জুন এখনও বাড়ি ফেরেনি। রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে ও তখনও লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজে। শর্মিকে ফোন করে ফিরতে দেরি হবে একথা জানাবার অবকাশও হয়নি। রাত এগারোটায় ফোনটা এসেছিল অফিসে, ও তখন পুলিশ গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিল। সাব ইন্সপেক্টর অফিস থেকে কল ডাইভার্ট করেছিল গাড়িতে— স্যার, ইমার্জেন্সি কল লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজ থেকে আপনার জন্য। ওভার টু ইউ স্যার।

অর্জুন মাউথপিসটা মুখের সামনে ধরে বলেছিল— হ্যালো! ডি এস পি চ্যাটার্জী স্পিকিং।

— গুড ইভনিং স্যার। ডক্টর অগ্নিহোত্রী স্পিকিং ফ্রম মেডিকেল কলেজ, বার্ন ইউনিট। পেসেন্ট পার্টি ওয়ান্টস টু স্পিক টু ইউ।

— ওকে, লেট দেম স্পিক।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়া গলায় ভাঙ্গা-টুকরো কথা অর্জুন বুঝতে পারছিল না প্রথমে। বারবার জিজ্ঞেস করার পর বুঝতে পারল ইমতিয়াজ আখতার কিছু বলছেন— দোনো ঝুলস গয়ে ডি এস পি সাব। আপ জলদি আইয়ে। ম্যায় বরবাদ হো গয়া...

ধ্বক করে ওঠে ওর বুক। দোনো কারা? মিষ্টি-শাজাদ? না, না। অন্য কেউ হবে। ড্রাইভারকে বলল— গাড়ি ঘোরাও, মেডিকেল কলেজে চলো তাড়াতাড়ি। দশ মিনিটে পৌঁছে গিয়ে

যা শুনলো তাতে মাথা কাজ করছিল না। ডাক্তার বললেন— মেয়েটির নাইনটি থ্রী পার্সেন্ট বার্ন্ট আর ছেলেটির এইট্টি পার্সেন্ট। পেট্রলের আগুন তার ওপর পরনে সিন্থটিক পোশাকের পোড়া টুকোরা সেঁটে ছিল শরীরের নানা জায়গায়। মেয়েটিকে বাঁচানো যাবে না। ছেলেটিকেও ভরোসা দিতে পারছি না। ওর বুক, পেট, দুটো হাত পুড়ে গেছে, নাভি অ্যাফেক্টেড হয়েছে। আমরা চেষ্টা করব, কিন্তু ভগবানের ওপরে তো যেতে পারব না। পুলিশের আসার অপেক্ষা করিনি স্যার, আনার সঙ্গে সঙ্গে ট্রিটমেন্ট শুরু হয়েছে।

— ডক্টর অগ্নিহোত্রী, স্টেটমেন্ট দেবার অবস্থায় আছে একজনও?

— না। দুজনই বেহোঁশ। মনিটরিং চলছে, জ্ঞান ফিরলে জানাবো। চলুন বার্ন্ট ইউনিট আই সি ইউতে। বাইরে থেকে দেখতে পাবেন, তবে শরীর মলমে ঢাকা। মেয়েটির মাংসও পুড়ে গেছে সারা শরীরে। ছেলের পায়ের দিক অতো পোড়েনি, কিন্তু ওপরে ভাইটাল পার্টস খুবই বেশি পুড়েছে। চলতে চলতে বলতে লাগলেন ডাক্তার।

পাশাপাশি দুটো বেডে মোটা মলমের আস্তরণে ঢাকা দুটি অজ্ঞান দেহ। ভেতরে দুজন ডাক্তার একজন নার্স রয়েছে। অর্জুনের মনে হলো মৃত্যুর মুখের সামনেও ওরা একসঙ্গে আছে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল আপনা-আপনি। শাজাদের পায়ে স্থানে স্থানে ছোট ছোট মলমের আস্তরণ, তলপেট থেকে মুখ অব্দি পুরোটাই মলমে ঢাকা পড়েছে। আর মিষ্টি মাথা থেকে পায়ের পাতা অব্দি যেন হলুদ রংয়ের বরফে চাপা পড়েছে। সহ্য করতে না পেরে ওয়েটিং লাউঞ্জে ফিরে এলো ও। ইমতিয়াজের বড় ভাই এসে পাশে বলে বলল— ডি এস পি সাব, বহুকা পিহর (পিত্রালয়) খবর ভেজনা জরুরি হ্যায়। হমারে পাশ পতা-ঠিকানা ফোননম্বর কুছ ভী নহী হ্যায়।

বয়স্ক মানুষটির কথায় অর্জুন বাস্তবে ফিরে এলো। ও শুধু মিষ্টির ছোড়দা নয়, একজন পুলিশ অফিসারও বটে। হ্যাঁ, বাড়িতে জানাতে হবে। থানায় ফোন করে আখতারের বাড়িতে ইনভেস্টিগেশনের জন্য পুলিশ, ফরেনসিক ইনভেস্টিগেটার পাঠাতে হবে। আগাম না পাঠালে আগুনে পোড়ার সূত্র মুছে যেতে পারে। এখন কাঁদার সময় নয়, তৎপরতার সময়। রুমালে চোখ মুছে থানায় কথা বলল মোবাইল থেকে। এবার যে বাড়িতে জানাতে হবে! কী করে জানাবে? মিষ্টি চলে গিয়েছিল, কিন্তু বেঁচে তো ছিল। এখন কী বলবে? পুলিশ দাদার চোখও শুকনো থাকছে না। বখতিয়াজ আখতার ওর পিঠে হাত রাখলেন— হিম্মত না ছোড়িয়ে, আপকা বহন কা জান কা মসলা হ্যায়, য়ে মসলা কা তহকিকাৎ আপ খুদ করেঙ্গে। ইতনা খুশ জিগর দো বচ্চে কিঁউ জান গাওয়ানা চাঁহা ইস বাত কা হকিকত আপকো ঢুন্ডনা পড়েগা। খুদখুশি কে পিছে কা পর্দা ফাঁস করনা হী পড়েগা।

শর্মি বোধহয় না খেয়ে অপেক্ষা করছে। ওকে ফোন করে বলল— আমি রাত্রে বাড়ি ফিরতে পারব না, ইমার্জেন্সিতে আটকে পড়েছি। তুমি খেয়ে শুয়ে পড়। এরপর দাদাকে ফোন লাগালো। ওদিক থেকে ঘুমন্ত গলায় বাপ্পা বলল— এতো রাত্রে ফোন করলি, কী হয়েছে?

— প্রশ্ন করিস না। কাউকে না বলে এক্ষুনি মেডিকেল কলেজে আয়। আমি বার্ন্ট ইউনিটে আছি। লাইন কেটে দিল।

বাকি রাত পুরোটাই চোখের সামনে ইলেকট্রনিক বক্সে 'শাজাদ আখতার শবনম আখতার ক্রিটিক্যাল— লাল বাতি দুটো জ্বলতে থাকল। ভোর পাঁচটায় শবনম আখতারের ক্রিটিক্যাল মুছে গিয়ে নতুন শব্দ ফুটে উঠল— এক্সপায়ার্ড। শাজাদ ক্রিটিক্যাল।

তিনদিন পর শাজাদের নামের পাশেও দুপুর দেড়টায় এক্সপায়ার্ড শব্দটা ফুটে উঠেছিল। দুটো পরিবারের সর্বনাশের ব্যাখ্যা না করাই ভাল।

পুলিশ আর ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের রিপোর্টে এমনকি পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও স্যুইসাইড বলেই মেনে নেওয়া হয়েছে। মিষ্টির শরীরে পোড়া ছাড়া অন্য কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না। এনকোয়্যারিতে যা যা জানা গেছে, তার সঙ্গে শাজাদের জ্যাঠা বখতিয়াজ ইমতাজের অর্জুনের কাছে ঘটনার রাতে মেডিকেল কলেজে বসে বলা প্রত্যেকটা কথার সত্যতা প্রমাণ হয়েছে। সেই রাতে খাওয়ার পর সবাই নিজের কামরায় চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু তখনও ঘুমোননি। শাজাদ আর ওর খুড়তুতো ভাই আজাদ নীচে কিছুক্ষণ ছিল, তারপর ওরাও ওপরে চলে আসে। আর তখনই শাজাদের চিৎকার শোনা যায় আগুন, আগুন। সবাই ছুটে এসে দেখেন শাজাদ ওদের রুমের অ্যাটাচড্ বাথরুমের দরজা ভাঙ্গার জন্য লাথি মারছে। বাথরুমের দরজার নীচের ফাঁক দিয়ে ধোঁওয়া বের হচ্ছিল। সবাই মিলে দরজা ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে যা দেখেছিলেন তার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। ভেতরে আগুনের লপেটা সিলিং পর্যন্ত উঠেছে, আগুনের ভেতরের মানুষটাকে দেখা যাচ্ছিল না। শাজাদ দরজা ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে আগুনে ঢুকে পড়ে জ্বলন্ত মানুষটাকে টেনে শাওয়ারে নিয়ে যাবার সময় পলিথিন শাওয়ার কার্টেনেও আগুন ধরে যায়। শাজাদ ওকে জড়িয়ে ধরে থেকে শাওয়ার খুলেও ফেলেছিল, কিন্তু আগুন নিভছিল না। পোড়া পেট্রলের গন্ধ বের হচ্ছিল আর শক্ড হয়ে পাথর হয়ে যাওয়া ওনাদের চোখের

সামনে ওরা দুজন পুড়ছিল। আজাদই প্রথম কোথা থেকে একটা ব্ল্যাংকেট এনে ওদের চাপা দিয়েছিল। যে জন্য আজাদের হাতে মামুলি ফোস্কা পড়েছে। শাওয়ারের নীচে কম্বল চাপা দেবার পর আগুন নিভেছে। অ্যাম্বুলেন্সের অপেক্ষায় থাকেনি ওরা। দুটো গাড়িতে দু'জনকে শুইয়ে তক্ষুনি মেডিকেল কলেজে রওয়ানা হয়েছেন। পুলিশ বাথরুমে পেট্রলের জ্যারিক্যান, ভিজে কম্বল, আধপোড়া শাওয়ার কার্টেন ছাড়া আর কিছুই পায়নি। শবনম স্যুইসাইড নোট লিখে রেখে যায়নি। বাড়ির প্রত্যেককে আলাদা ভাবে জেরা করেছে, সকলে একই বয়ান দিয়েছে। কোনো কনট্রাডিকশন ছিল না তাদের কথায়। বান্দা-বান্দীরাও বলেছে শবনম বেগম খুব শান্ত প্রকৃতি ছিল, সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত, এক বছরে তাকে কেউ রাগ করতে দেখেনি। সেদিনও বাড়িতে পুরো শান্তির বাতাবরণ ছিল প্রতিদিনের মতোই। ঝগড়াঝাঁটি এখানে হয়ই না। পেট্রল বান্দারাই কিনে এনে গ্যারেজে রাখে। এদের ছ'টা গাড়ি দুটো বাইক আছে। হঠাৎ প্রয়োজনের জন্য পাঁচ লিটারের জ্যারিক্যান বরাবর গ্যারেজে মজুদ থাকে।

কেস রিপোর্ট পড়তে পড়তে অর্জুন বুঝতে পারছিল কোথাও লুপহোল নেই। মিষ্টি সকলের মন জয় করে সুখে ছিল। স্যুইসাইড নোট না রেখে গেলেও এটা স্যুইসাইডই। কিন্তু কেন হঠাৎ এমন ইচ্ছে হলো ওর? অনেকের বেশি টাকা বেশি সুখ সহ্য হয় না, ওরও কি সেরকম হয়েছিল? না কি কেউ ওকে সকলের আড়ালে যথেষ্ট মেন্টাল টর্চার করত? মুখবোজা মেয়ে যে কথা কাউকে বলতে পারেনি কখনো। শাজাদের সঙ্গে গণ্ডগোল? না, তাহলে শাজাদ নিজে অতক্ষণ ধরে ওকে জড়িয়ে ধরে আগুনে পুড়ে মরার জ্বালা সইতো না। রহস্য নিশ্চয় আছে, যা আমরা ধরতে পারছি না। বখতিয়াজ আখতার নিজেও abetment টু স্যুইসাইডের ইঙ্গিত করে তহকিকৎ করে হকিকৎয়ে পৌঁছানোর উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু সূত্র-প্রমাণ কোথায়? ওনার সঙ্গেই আবার কথা বলতে হবে। বিনা কারণে শখ করে কেউ আত্মহত্যা করে না।

শর্মির জীবনটা হাসিখুশিতে ভরা ঝকঝকে আকাশের মতো ছিল। এখন যেন আবহাওয়া বদলে গেছে। গত এক বছর ধরে মেঘের ছায়ায় ঢাকা ছিল আর তিন-চার দিন ধরে তো ননস্টপ সাইক্লোন চলছে। একটুক্ষণ আগে ঝড়ে বিধ্বস্ত পিসিমার বাড়ি থেকে ফিরেছে। ও ভয়ানক বিচলিত। এমন বেদনাতুর ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় জীবন প্রথম। নিজের সঙ্গে নিষ্ঠুরতা কেন করল মিষ্টি? কী করে নিঃশব্দে সহ্য করল দাউ দাউ আগুনে পোড়া?

— মেমসাব ডাকিয়া আয়া। আপকা কুছ আয়া হ্যায়। মুঝে দে নহী রহা।

শিউশরণ বাইরে থেকে ডাকছে। বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে রেজিস্ট্রি ডাক সই করে নিয়ে এলো। লম্বা খামটা ঘুরিয়ে দেখে সেন্ডার শবনম আখতার লেখা পেছন দিকে। নামের তলায় ঠিকানা। কেঁপে উঠল শর্মি। মিষ্টি পাঠিয়েছে চিঠি? ওর মৃত্যুর চারদিন পর এলো, তার মানে মৃত্যুর ঠিক আগে এটা রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়েছে? হাত তো কাঁপছিলই, খুলতেও ভয় পাচ্ছে। বুকের ভেতর কেমন যে করছে! বুঝতে পারছে মিষ্টি শেষ পর্যন্ত ওকেই কিছু বলতে চেয়েছে। বিছানায় বসে সাহস সঞ্চয় করে খুলে ফেলল খাম। ভেতর থেকে বের হলো চলে যাবার সময় নিয়ে যাওয়া সার্টিফিকেটগুলো, ভোটার কার্ড, দুটো উর্দুতে লেখা কাগজ যা ও বুঝতে পারল না, আর চিঠি নয়, কাচা হাতের বাংলায় লেখা কয়েক পাতা স্টেপল করা কাগজ। শর্মি অন্য সব সরিয়ে বাংলায় লেখা কাগজগুলো পড়তে লাগল আর কাঁদতে থাকল। আবার পড়ল আবারও কাঁদল। বারবার কত বার! কখন যে অর্জুন লাঞ্চ করতে এসে পড়েছে টের পায়নি।

অর্জুনও দুবার পড়ে সব এনভেলাপে ভরে বলল— কী তুখোড় বুদ্ধি ছিল মেয়েটার! শুধু যদি সেন্টিমেন্টালিটি ছেড়ে প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করতে পারত তাহলে আজ ও বেঁচে থাকত শর্মি। এত বুদ্ধি নিজে বাঁচার জন্য, শাজাদের সঙ্গে সুখে জীবন কাটানোর জন্য ব্যবহার করতে পারত। অযথা দুই অশিক্ষিত মহিলার প্রতি প্রতিহিংসা মেটাতে চেয়ে নিজের প্রাণটাই দাওয়ে লাগিয়ে চরম বোকামির পরিচয় দিয়েছে। আবেগপ্রবণ হয়ে একটার পর একটা ভুল করেছে জেদের বশে। ওর জন্য দুটো পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল। কনভার্ট হবার সময় মনে ছিল না যে মুসলমান হচ্ছে? বোরখা পরতে হবে, গোরুর মাংস খেতে হবে? মুসলমান বাড়ির বৌ হলে ওদের রীতি মেনে চলতে হবে? আমি ওকে ক্ষমা করতে পারছি না।

মিষ্টির সই করা দলিল কাজে লেগেছিল পরে। পিসেমশাই হাইকোর্টে কেস করেছিলেন মুনিয়ারা বেগম আর সায়রা বেগমের বিরুদ্ধে। মানসিক নির্যাতন করে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার উদ্দেশ্য প্রমাণ হয়েছিল মিষ্টির লিখিত দলিল থেকে। আশ্চর্যের ব্যাপার— বখতিয়াজ আখতার নিজে মিষ্টির অর্থাৎ শবনম আখতারের পক্ষে সাক্ষি দিয়েছিলেন। হাইকোর্ট দুই মহিলাকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিল। বখতিয়াজ আর সুপ্রিম কোর্টে আপিলই করেননি। দুই বেগমকেই জেলে যেতে হয়েছে। সাচ্চা মানুষ বখতিয়াজ প্রমাণ করেছেন মুসলমানও মানবিক অধিকার লঙ্ঘন করলে আপনজনকেও দণ্ড ভোগ করতে দিতে পিছিয়ে আসে না।

অর্জুন এখন রিটায়ার্ড। রিটায়ার্ড আর্মি— পুলিশ অফিসারদের বাতিক থাকে চাকরি জীবনের চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা নিয়ে বই লিখে সময় কাটানোর। ও এখন তাই করছে। নিজের আদরের পিসতুতো বোন মিষ্টির আত্মহত্যা, কোর্ট কেস লিখতে গিয়ে ওর মনে হয় মিষ্টির মৃত্যুরহস্য পুরোপুরি উদ্‌ঘাটন হয়নি। কোথাও যেন ফাঁক রয়ে গেছে। সারকামস্টেশিয়েল এভিডেন্স আর বখতিয়াজ আখতারের সাক্ষ্যের ওপর লোয়ার কোর্ট দুই বেগমকে সাজা শুনিয়েছিল। বখতিয়াজ আর আপিল করেননি। কিন্তু বেগমদের বাপের বাড়ি হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট অব্দি গিয়েছিল। কেস কয়েকবছর চলেছে। শাজাদের তাইজী আর ছোটি চাচীকে এই কয়েক বছর সাজা ভুগতে হয়েছে abetment to suicide -এর চার্জে— এই পর্যন্ত সব ঠিকই আছে। কেবল মিষ্টি-শাজাদের মৃত্যুর জন্য নয়, পিসেমশাই ছোট পিসি মেয়ের মাংস-হাড়গোড় পর্যন্ত পুড়ে যাওয়ার বিভীষিকা সহ্য করতে পারেননি। মিষ্টির পেছন পেছন পিসেমশাই চলে গেলেন। তাঁর চলে যাবার বয়স কিংবা দীর্ঘস্থায়ী কোনো রোগ ছিল না। বিনা নোটিশে ঘুমের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। এরপর ছোট পিসির মতো স্মার্ট, বুদ্ধিমতী মানুষটার মেন্টাল ব্রেকডাউন হলো।— এই সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী মিষ্টির মৃত্যু। ওর অপরিণামদর্শিতা। অর্জুন আজও মিষ্টিকে ক্ষমা করতে পারে না, ভুলতেও পারে না। ওর লিখে রেখে যাওয়া জবানবন্দি কোর্ট গুরুত্ব দিয়ে গ্রাহ্য করেছে, কিন্তু অর্জুনের পুলিশি মাথা কিছুতেই এটাকে আত্মহত্যার যুক্তিসঙ্গত কারণ বলে মেনে নিতে পারেনি। তুমি মুসলমানদের মাঝখানে জন্মালে, বড় হলে, ওদের রীতি-রেওয়াজ সব জানতে। নিজে থেকে গিয়ে মুসলমান হয়ে নিকাহনামা কবুল করে শবনম আখতার হতে পেরেছ, তারপর ওদের ধর্মীয় সংস্কার মেনে

চলতে তোমার আপত্তি কেন হলো? তুমি তো আর হিন্দু ছিলে না। পাকাপাকি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলে, তাহলে বোরখা পরতে, আব্রু রাখতে, নমাজ পড়তে, রোজা রাখতে আপত্তি জানালে ওরা মেনে নেবে কেন? তুমি পার্সে মা কালীর ফটো নিয়ে একটা সাধারণ মানের মুসলিম ফ্যামিলির বৌ হতে গিয়েছিলে কি আশা করে? শাজাদকে এতো ভালবেসে যদি সব কিছুই ছাড়তে পারলে তাহলে আন্তরিক ভাবে নিজের আগের ধর্মীয় আচরণ ত্যাগ করে শাজাদের ধর্ম মেনে নেওয়া উচিত ছিল। বাড়ির দুজন মহিলা ছাড়া অন্য সকলে তোমাকে ভালবাসত। বিশেষ করে শাজাদ আর পরিবারের কর্তা বখতিয়াজ আখতার। বকরীদের দিন তুমি ওদের বলতে পারতে গো-মাংস খেতে পারবে না। ওরা বুঝতো এবং তোমাকে যাতে গো-মাংস খেতে না হয় সেই ব্যবস্থা অবশ্যই করত। বহু মুসলমান আছে, যারা বিফ খায় না, তুমি সেরকম একজন মুসলমান হয়ে থাকতে পারতে। বহু হিন্দু আছে যারা বিফ স্টেক্স খেতে ভালোবাসে। এটা ভোজনরসিকদের রুচির ব্যাপার। তোমার তাইজী শাশুড়ি আর ছোটি চাচী শাশুড়ি কিন্তু ঠিকই বলেছিল— তুমি শুধুমাত্র শাজাদকে পাবার জন্য ধর্মান্তরিত হয়েছিলে, মনে মনে হিন্দুই থেকে গেছো। তোমার ডাবল স্ট্যান্ডার্ড সমস্ত অনর্থের কারণ।

মিষ্টির মৃত্যুর পর শর্মির নামে পাঠানো লেখাটা পাবার পর থেকে ওর মনে যে প্রশ্ন তখনও জেগেছে এবং এখন এতবছর পরেও জেগে আছে, সেটার উত্তর খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যায় অর্জুন। বকরীদের দিনদুপুরে ওকে জোর করে গো-মাংসের টুকরো মুখে ঢোকানো হয়েছিল। তারপর ও মুখ ধুয়ে স্নান করে নিজেকে শুদ্ধ করেছে বলে মনে করেছিল। সেদিনই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় শাস্তি দেবার জন্য। সেদিনই ও লিখতে বসেছে। বাংলায় লেখার অভ্যাস কম বলে ওটা লিখতে সাতদিন সময় লেগেছে ওর। পরে পোস্টঅফিসে বসে আরও একটু লিখে রেজিস্ট্রি করেছে শর্মির নামে। যদি মিষ্টি বকরীদের দিনই আত্মঘাতী হতো তাহলে যুক্তি একটা থাকত। কারণ স্যুইসাইড একটা মুহূর্তের উত্তেজনায় করে ফেলে মানুষ। এতোদিন পর এক টুকরো বিফ মুখে গুঁজে দেওয়ার কারণে গায়ে এক জ্যারিক্যান পেট্রল ঢেলে ভয়ঙ্কর কষ্টকর মৃত্যুর পথ বেছে নেওয়াটা অর্জুনের যুক্তিবাদী মন মানতে চাইছে না। স্যুইসাইডের আগের মুহূর্তে কিংবা সেদিন কোনো না কোনো সময় এমন কিছু হয়েছিল, এমন মানসিক আঘাত ও পেয়েছিল যা ওকে স্যুইসাইড করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু সেটা কী?

অর্জুন ওর সার্ভিস জীবনে বহু জাতি, বহু ধর্মের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, কাছ থেকে দেখার জানার সুযোগ পেয়েছে। ছদ্ম সেকুলারিজমের মুখোশ আঁটা মানুষদের চিনতে ওর দেরি হয় না। বখতিয়াজ আখতার এক ব্যতিক্রমী মানুষ, তাঁর চরিত্রে সাচ্চাই ছাড়া ঝুটের কোনো চিহ্ন দেখেনি কোনোদিন। ওনার সঙ্গে ওর মৃত্যুর আগে অবধি সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি অর্জুনের। বাবা ছাড়া এই একটি মাত্র মানুষকে ও শ্রদ্ধা করত। বখতিয়াজ খাঁটি মুসলমান হয়েও প্রকৃত অর্থে সেকুলার ছিলেন। কোনো ব্যাপারে মুখোশ পরতে হতো না তাঁকে। সাধারণ মানুষটি অর্জুনের নজরে অসাধারণ হয়ে উঠেছিলেন সততা আর ব্যক্তিত্বের জোরে। ওঁর সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ থাকলে মন ভাল লাগত। কতবার কত দুর্ভেদ্য কেস নিয়ে বখতিয়াজের কাছে গেছে ও পরামর্শ করতে। উনি ওকে আর স্যার বলতেন না, বেটা বলে সম্বোধন করতেন। পিসেমশাইয়ের মৃত্যু সংবাদ দিতেই চলে এসেছিলেন। একবারও ভাবেননি এই বাড়ির মেয়ের অতি সংবেদনশীল নির্বুদ্ধিতায় ওদের ছেলে মরেছে। মুহ্যমান ছোট পিসির পাশে বসলেন, দাদাকে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিলেন, শ্মশান যাত্রায় সঙ্গী হলেন পরাত্মীয়ের মতো।

সত্য বলতে মুসলমান ক্রিমিনাল ঘেঁটে ঘেঁটে অর্জুনের মনে যে মুসলিম বিদ্বেষ জন্মেছিল, বখতিয়াজের সংস্পর্শে এসে সেটা আস্তে আস্তে দূর হয়েছিল। বুঝেছিল, ঐ সমাজ ওনার মতো মানুষ সংখ্যায় কম হলেও আছে। মিষ্টির আত্মহত্যা নিয়ে যে প্রশ্ন ওর মনে এসেছে, সেই প্রশ্ন ওনার মনেও এসেছিল। এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে ওদের মধ্যে কয়েকবার। দুজনের কেউই সমাধানে আসতে পারেনি। ওনার ধারণা সেই রাত্রে শাজাদ হয়তো রেগে গিয়ে শবনমকে এমন কোনো কথা বলেছে যা শবনম আশাই করতে পারেনি। ওর হৃদয়, ওর বিশ্বাস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়। তাই নিজের জান দিয়ে দিতে চেয়েছে। এছাড়া আর কী কারণ হতে পারে? ওদের ঘরের ভেতরে দুজনের মধ্যে কিছু হলে বাড়ির অন্য সকলের গোচরে কী করে আসবে বল? শাজাদ রেগে গেলে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলতো মুহূর্তের জন্য। একটু পরেই রাগ ভুলে আবার আগের মতো হয়ে যেত। এক সপ্তাহ আগের কথা বলতে পারব না, কিন্তু সেইদিন বা রাতে বাড়িতে কারো সঙ্গে কারো কোনো অশান্তি হয়নি।

অর্জুন জানতো উনি মিথ্যে বলে সত্য গোপন করার চেষ্টা করেননি বরং একটা সম্ভাব্য সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ইঙ্গিত কখনো প্রমাণ বলে মানা যায় না। তাই আজও প্রশ্নটা প্রশ্ন হয়েই রয়েছে। রহস্যের জট আর কোনোদিনই খুলবে না, ফাঁক ভরবে না। যারা এই ফাঁক ভরতে পারত সেই দুজনই একসঙ্গে চলে গেছে দুনিয়া থেকে। তবুও ওর মনে প্রশ্নটার মৃত্যু হয়নি। সমাধান করতে পারেনি বলে বারবার এসে উঁকি দেয় মনে। ■

With Best Compliments From -

W L

Willowood Chemicals Private Limited

MK Point
AT 27, BENTINCK STREET,KOLKATA

AGRAWAL & AGRAWAL

A World-class (B+G+7 Storied) office building, in the heart of the central business district, on 27, Bentinck Street, Kolkata- 700 001

By

M K GROUP

Contact no. 033-32901999

www.mkpoint.in

হিন্দুরাষ্ট্রের দাবি অনিবার্য হয়ে উঠছে কেন?

দেবীপ্রসাদ রায়

১৯৪৬ সালে নৃশংস গণহত্যা এবং অত্যাচারের মাধ্যমে মুসলিমরা স্রেফ ধর্মান্ধতাকে অবলম্বন করে একতরফা রক্তাক্ত দাঙ্গা চাপিয়ে দিয়েছিল সাধারণ ভারতীয় তথা হিন্দুদের উপর। তারই জন্য ভারতকে খণ্ডিত করে ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টি হল। অবশিষ্ট ভারত তার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের নিয়ে হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে তা স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গতই হোত। কিন্তু তা হল না। কারণ, হিন্দু তথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধর্মভিত্তিক মানব-বিভাজন কখনোই প্রশ্রয় পায়নি। তাই সুদূর ধূসর অতীত থেকে ঐতিহাসিক অতীত পেরিয়ে বর্তমানকাল অবধি অভারতীয় রাষ্ট্রধারণাকে প্রতিহত করে ভারতীয় জনসাধারণ বহিরাগত ভিন্নধর্মী আক্রমণকারীদের ব্যাপক অত্যাচার, হত্যা, হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস-সহ দীর্ঘকালীন উৎপীড়নের পশ্চাৎপটেও অনুসৃত সংস্কৃতি বজায় রাখার জন্য ধর্মীয়ভাবে চিহ্নিত রাষ্ট্র চায়নি। চাইলে কোনো যুক্তিতেই তা আটকানো যেত না। কারণ তাকে ঘিরে থাকা সব রাষ্ট্রই কালক্রমে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যে নিজেদের চিহ্নিত করেছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচয়িতারাও ভারতের অন্তর্লীন ধর্মনিরপেক্ষ রাজধর্ম ও ধারণাকে মর্যাদা দিয়ে আলাদাভাবে ভারতকে সেকুলার বা কৃত্রিমভাবে ভুলভাষ্যে 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করেনি, যদিও তা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পছন্দমতো ছিল না। প্রকাশিত সংবিধানের প্রথম কয়েকটি পাতা অলংকৃত ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরাজ্ঞাপক কিছু চিত্র দিয়ে যাতে ভারতীয় সংস্কৃতির কথা রাষ্ট্রনায়কদের চিত্তে সর্বদা জাগরূক থাকে। কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গেল, কখন যেন ওই চিত্রগুলি অপসারণ করা হয়েছে। আস্তে আস্তে এও প্রকট হল সংবিধানের উদ্দেশিকা (Preamble)-কে ব্যহত করার একটা চেষ্টা চলছে। যে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল

মন্ত্র হয়ে উঠেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রদত্ত যে মন্ত্র উচ্চারণ করে ইংরাজ শাসকদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করে সর্বস্ব দিয়েছেন হাজার হাজার বিপ্লবী, তাঁদের সেই মন্ত্র সেই সঙ্গীতকে হতমান করা হল কাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে, না, মুসলিমদের। যাদের ভারতে থেকে সাধারণ ভারতবাসীদের সঙ্গে সহমর্মী হয়ে যাওয়ারই কথা। কিন্তু প্রথম থেকেই এরা এক বিচ্ছিন্নতাবাদী জনগোষ্ঠী হিসেবেই কাজ করতে শুরু করল।

ভারতবাসীর সাধারণ উন্নতি ও স্বার্থ এবং কল্যাণের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ধর্ম-জাতপাত নিরপেক্ষভাবে যে আইনই সরকার করতে চায় সেখানেই ধর্মীয় প্রশ্ন এনে তাতে বাধা প্রদান করতে থাকল মুসলিমরা, যেন তারা ভারতবাসী নয়, ভারতীয় নয়। চলনে বলনে ঘোষণা করল তারা আগে মুসলিম, পরে ভারতীয়। তারা ভাবতেই চাইল না ভারতকে ধর্মীয়ভাবে ভাগ করে তারপরেও এইসব ধারণা বহন করার কোনো সুযোগই নেই। আস্তে আস্তে তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এই আশায় তাদের সুপ্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হল না। ভাবা হল বা ভাবানো হল সাধারণ মানুষকে যে মোল্লাতন্ত্রের প্রভাবে ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রভাবে আবদ্ধ এদের জন্য কিছু সময় দরকার।

কিন্তু স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও মুসলিমদের সেই শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটতে দেখা গেল না। ভারতের কালোত্তীর্ণ সাংস্কৃতিক রসায়নে শুভবুদ্ধির উন্মেষ যদিও বা কোনো ভগ্নাংশে ঘটতে শুরু করেছিল, ওয়াহবি আন্দোলনের বহিঃস্থ দূর নিয়ন্ত্রিত পরিচালনায় তাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হল। ফলে জন্মভূমি ভারতের প্রতি দায়বদ্ধতা নয়, হিংস্র পরধর্ম-অসহিষ্ণু ইসলামের প্রতি দায়বদ্ধতাকেই মুসলিমরা গ্রহণ করল উনংবিশ শতাব্দীর নবজাগরণের স্পর্শ বাঁচিয়ে, অশিক্ষা ধর্মীয় কুসংস্কারে ডুবে থেকে।

সুদূর অতীতকে না ধরলেও অদূর অতীতের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মুসলিমদের ভূমিকাতেই এটি প্রত্যয়িত হয়।

ঢাকার নবাব সলিমুল্লা কার্জনের যে বঙ্গভঙ্গ প্রয়াসকে প্রথমদিকে শয়তানি বলে নিন্দা করেছিল, যার ভাই খাজা আতাকুল্লা কংগ্রেসি মঞ্চ থেকেই ১৯০৬ সালে ঘোষণা করেছিল, 'প্রথমেই আমি আপনাদের একথা জানিয়ে দিতে চাই যে, পূর্ববঙ্গে মুসলমানরা কার্জনের বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে— একথা ঠিক নয়, সত্য কথাটা হল কিছু প্রমুখ মুসলমানই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই কাজকে সমর্থন করেছে।' সেই সলিমুল্লাই ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে একাটি মুসলিম প্রধান প্রদেশ, মুসলিম রাজত্ব ফিরে পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়ে সরকারের কাছ থেকে নামমাত্র সুদে এক লক্ষ পাউন্ড পেয়ে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে ঢাকার বাড়িতে ইংরাজ পরামর্শমতো বঙ্গভঙ্গ সমর্থক 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত করে ভবিষ্যৎ ভারত ভাগের বীজ বপন করে রাখল। বস্তুতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে মুসলিম সংযুক্তি সংখ্যার দিক দিয়ে ছিল খুবই কম। তাই সাধারণ ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংযুক্তিও ছিল না এবং এই চরিত্র গোটা মুসলিম শাসনকালে যেরকম ছিল, স্বাধীনতার পরও তাই আছে। এদের উপর আস্থা রাখাটাই আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের বিরাট ভুল ছিল এবং এই ভুলের শুরুটা করেছিলেন গান্ধীজী নিজে খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে ভারতবাসীকে জড়িয়ে। তখন জিন্না আপত্তি জানিয়েছিলেন। কারণ মুসলিম চরিত্র তিনি সম্যক জানতেন এবং বুঝতেন। ঠিক তাই হল। তুরস্কে খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হলে ভারতে মুসলিমরা হিন্দু নিধনে মত্ত হল। এ ঘটনা তো ঘটেই চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। কাশ্মীরে হজরতবাল চুরির মিথ্যা গুজব তুলে হিন্দু নিধন হল, মন্দির গুঁড়িয়ে দেওয়া হল— কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হল। সাধারণ ভারতবাসীর উন্নতিকল্পে রচনা করা প্রতিটি আইন মুসলিম বিরোধিতার সম্মুখীন হল। সে অভিন্ন দেওয়ানি বিধিই হোক বা পরিবার পরিকল্পনাই হোক। মুসলিম ভোট পাওয়ার জন্য সেকুলার সাজা ভণ্ডদের সমর্থনে এই মুসলিম ব্ল্যাকমেলিং চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিম চরিত্র একইরকম। এইজন্য রাশিয়া, চীন যথোচিত ব্যবস্থা নিয়েছে। ৪ মে ২০১৩ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন সংসদে ঘোষণা করেছিলেন, "In Russia leave Russians any minority from any where, if it wants to live in Russia, to work and eat in Russia should speak Russian and should respect Russian laws. If they prefers shariat laws then we advice them to go to those places where that is the state law. Russia does not need minorities. Minorities need Russia and we will not grant the special previlage or try to change our laws to fit their desires no matter how loud they yell discrimination"। তথাকথিত সেকুলারদের প্রশ্রয় এবং তোষণে আজ সংখ্যালঘু মুসলিমদের পেশির আস্ফালনে আক্রমণে জর্জরিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তথা হিন্দুদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছ। একটা স্বভাব সহিষ্ণু ও গ্রহিষ্ণু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আর নিজের ক্ষয়িষ্ণু অস্তিত্বকে উপেক্ষা করতে পারে না। চীন কী করেছে? নিজেদের অস্তিত্বকে কোনোমতেই কোনো চ্যালেঞ্জের সামনে আসতে না দিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে—

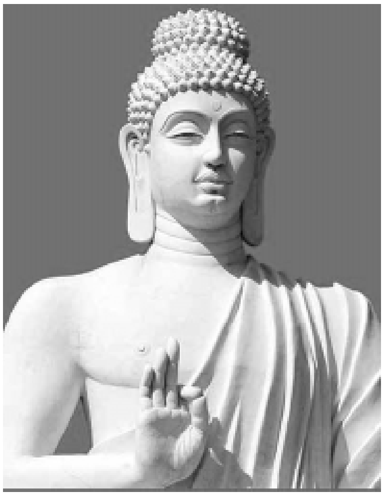

(১) চীনে ৫০ বছরের কম বয়সী উইগার মুসলিমদের হজে যাওয়া নিষিদ্ধ।

(২) ১৮ থেকে কম বয়সীদের মসজিদ কিংবা অন্যত্র নমাজ পড়া নিষিদ্ধ।

(৩) মসজিদ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত আজান দেওয়া নিষিদ্ধ।

(৪) নমাজের পর রাজনৈতিক বা উস্কানিমূলক ভাষণ দেওয়া নিষিদ্ধ।

(৫) সিংকিয়াঙে সমস্ত মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

(৬) ইসলামি সাহিত্য প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(৭) মুসলিমদের ভাষা আরবিতে লেখা চলবে না, চীনা লিপিতে লিখতে হবে।

(৮) চীনা মুসলিমদের চীনা নাম রাখতে হবে।

ভারতে অনেক বেশি মুসলিম উৎপাতের সম্মুখীন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা। যত্রতত্র পাকিস্তানি পতাকা ওড়ে, স্বাধীনতা দিবসে মুসলিম অঞ্চলের কোথাও কোথাও ভারতের পতাকা উড়তে দেওয়া হয় না। মুসলিমপ্রধান হলেই সে অঞ্চলে হিন্দুদের শাঁখ বাজাতে দেওয়া হয় না। সান্ধ্য-কীর্তন বন্ধ করতে হয়। হিন্দুদের বসতি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে অত্যাচার চলছে। সরস্বতী পুজো বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকার নীরব নিষ্ক্রিয় থাকছে। হিন্দুদের আত্মরক্ষার অধিকার কি নেই? হিন্দুরাষ্ট্রের দাবি করা ছাড়া! উপায় কী? হিন্দুরাই যেন এখানে এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

তথাকথিত সেকুলাররা রাষ্ট্রধর্ম পালনে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গী কি ভুলে গেলেন? ১৯০৫ সালে জারকে দেওয়া লেনিনের চিঠির অংশ— "The state must not concern itself with religion, religious societies must not be connected with the state power. Every one should be absolutely free to profess whatever religion he prefers or recognises no religion.. there must be no discrimination whatever in the rignts of citizens on religious grounds.. no state grants must be made to eccllesiastic and religious societies which must become absolutely independent voluntary associations of like minded citizens"।

সরকারি ব্যবস্থায় বনবিবির পুজো, ইমামদের ভাতা বৃদ্ধি, হজযাত্রীদের জন্য হজহাউস নির্মাণ, সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর মাদ্রাসাগুলিকে বিপুলভাবে অনুমোদন ও সাহায্য দেওয়া এইসব কি ভণ্ড সেকুলারদের রূপ প্রকট করছে না?

বাংলাদেশে প্রতিদিন হিন্দুদের উপর অত্যাচার, হিন্দু মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়া, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, হিন্দু পুরোহিতদের গলা কেটে ফেলা— হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা, মূর্তি ভাঙ্গা— এসব বাংলাদেশের দুর্বৃত্ত রাজনৈতিক শাসকদলের লোকেদেরও রোজনামচা হয়ে গিয়েছে। বালির মধ্যে মুখ গুঁজে ভারত-বাংলা মৈত্রী, একই বৃন্তে দুটি ফুলের সৌন্দর্য স্বপ্ন দেখা কতদিন চলতে পারে? একটা বিশাল সংখ্যক মানুষ যদি ধৈর্যের সীমায় এসে অসহিষ্ণু হয়, ক্ষিপ্ত হয় কোন উপদেশের অমৃতবাণী তাদের সংযত করবে এবং কেন করবে, কোন গ্রহণীয় যুক্তিতে করবে? একটা সহিষ্ণু বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী নিরবচ্ছিন্ন অবিচার অত্যাচার অনাচারে ক্ষিপ্ত হলে কী হতে পারে তা সম্পর্কে সাবধান করেছেন "Rediscovery of India"-র লেখক আনসার হোসেন খান। মুসলিম নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন--- ".. Mr Sahabuddin Mr. Akbar, leave alone the Imam of the Sahi Mosque in Delhi were barking up the wrongtree.. they were only leading the communities of Indian muslim astray by legislations... those who took the line might get leadership but that road was destructive. It should be abandoned at once and the foundations laid for a permanent reconciliation. Failing that the flames would rise higher and in the end we could predict exactly which community would suffer most and count the greater number of corpses... Indian muslims must remember that their forfathers or rather their mediaeval co-religionists minority rules of India were beastly frightfull to the Hindoos (with exception such as Akbar). No Islam sanctioned their conduct. Temples were indeed demolished and their stones often used to construct mosuqe on the very site"।

প্রসঙ্গটা রামজন্মভূমি আন্দোলনে বাবরি ধাঁচা ধ্বংস ছিল। কিন্তু সে সব তো আজও সজীব। অনেক সাধারণ মুসলিম তাদের পূর্ব ভূমিকার স্মরণে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য বৃহৎ ভারতবাসী হিন্দু জনগোষ্ঠীর ভাবাবেগকে আহত করতে চায় না। কিন্তু বাইরের অর্থ ও নিয়ন্ত্রণপুষ্ট মুসলিম নেতারা তা সম্ভব করতে দিতে চায় না। সেকুলারিজম মানে কি হিন্দু, হিন্দু সংস্কৃতি, জীবনচর্যার বিরোধিতা? হিন্দুরা ভণ্ড সেকুলারদের ভূমিকায় জ্বলেপুড়ে তেতে আছে। মুসলিম কার্যকলাপে সেকুলারিজমকে ঢাল করে মুসলিম অনাচার আর চলতে দেবে না ভারতীয় বৃহদংশ মানুষরা। এই সেকুলারিজম দেখেই আনসার হোসেন খান বলেছেন— "India was never secular, is not secular and needs not to be secular"। সেকুলারিজম ঢাল করে করে হিন্দুবিরোধী কার্যকলাপ আর সহ্য করতে চাইছে না মানুষ। ভারতীয় ঔদার্যকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর অনৈতিক চাওয়া পাওয়ায় বিরক্ত ইন্দিরা গান্ধীকেও একটি মাইনরিটি ডেপুটেশনকে বলতে হয়েছিল ১৯৮৩ সালে "Minority can not claim to be safe by constantly irritating the majority"। বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, আগ্রাসী এবং সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী ভূমিকা আজ ভারতীয়দের কাছে সবরকম বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। এই উপমহাদেশ এক মিশ্র স্থিতিশীল সংস্কৃতি গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে অনেক আগেই মুসলিম ধর্মান্ধ আগ্রাসনবাদ শেষ করে দিয়েছে। ড. আর কে দাশগুপ্তর দুটি প্রবন্ধ (২-৪ জানুয়ারি স্টেটসম্যান ২০০৩, ২০ জানুয়ারি) যথাক্রমে "Promoting English" এবং "Secular literature flourished in Arabia. যাদের মনে আছে তারা সম্যক উপলব্ধি করবেন। শেষোক্ত প্রবন্ধের একটি অংশ : Arabian Sufism flour-

ished, coming in contact with the Buddhism and Hindusm, during the rule of Abbasid Khalifas Al Manaswar (754-775), Harun Al-Rassid (786-809)... Alberuni (973-1048) translated Patanjali Philosophy and Kapil's Sankhya Sutra in Arabic... with the arrival of Wahabism in Mecca in mid 18th century, all these secular fabrics were greatly damaged"। নিজেদের আধিপত্যবাদের জন্যই ইসলামের যে বিকৃতায়ন ঘটেছিল ওয়াহবিদের হাতে সেটাই ইসলামের ভবিষ্যৎ দর্শন ঠিক করে দিয়েছে। আজকের সন্ত্রাসবাদী মানবতাবিরোধী ইসলাম তারই পরিণতি। আয়াতোল্লা খোমেইনির জেলে ১১ বছর বন্দি থাকা নৃশংস অত্যাচারের শিকার ইরানের লেখিকা আজম কামগুলামের বক্তৃতায় "[World Congress 2002 International Humanist and Ethical Union]। ইসলাম সম্পর্কে চরম মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মূল্যায়নে ইসলাম মূলত হল মানুষের সমৃদ্ধি সুখ, মঙ্গল, স্বাধীনতা সাম্য এবং জ্ঞানের বিরোধী কিছু বিধি ও বিশ্বাসের গুচ্ছ। ইসলাম এবং পরিপূর্ণ মানবজীবন এরা পরস্পরবিরোধী ধারণা, ইসলাম মানেই হল সবচাইতে খারাপ এবং উগ্রতারই হিংস্রতম প্রকার। এই ইসলামের নীরব সমর্থকরা বিশ্বের জনসাধারণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেবার প্রয়াসে রত। কামগুলাম বলেছেন, এরা চেষ্টা করেন যাতে এটা মৌলবাদের প্রতি ঘৃণাতেই সীমিত থাকে। এরা বলে যেতে থাকেন যে, আমরা যাকে ঘৃণা করি, তা মৌলবাদ, যথার্থ এবং বাস্তব ইসলাম নয়, ভাষার কারচুপিতে এরা ইসলামের সংস্কারের এবং নারীর অধিকারের প্রতি কোরাণের ভাষ্যের ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরার শপথ গ্রহণ করেন। এরা ইসলামি নারীবাদের আদর্শ তুলে ধরেন এবং নারীর বিরুদ্ধে ইসলামের দানবিক রূপকে মানবিক রূপ প্রদানের চেষ্টা করেন।'

আমরা এখানে এই ধরনের বর্ণচোরা সেকুলারদের তিন তালাক প্রশ্নে স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি।

পাশের দেশ, বাংলাদেশে প্রতিদিন হিন্দু এবং অমুসলিম মানুষের উপর আক্রমণ চলার খবর আসছে। পশ্চিমবঙ্গে এমনদিন খুব কমই আছে যেদিন এখানে কোথাও না কোথাও মুসলিম নষ্টামি হচ্ছে না। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, মুসলিম আক্রমণের ঘটনাগুলি চেপে দেওয়া হচ্ছে সরকারি নির্দেশে। অপরাধীদের সাজা দেওয়া হচ্ছে না। মূলত পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে ক্ষোভ তুষাগ্নি জ্বলছে, আগামী দিনে তার প্রকাশ ভয়ানক হতে পারে। তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে পশ্চিমবঙ্গের সরকার।

একটা উল্লেখ এই প্রসঙ্গে না করে পারছি না, বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের খবর আসা মাত্রই বাম সমর্থক ছোট বড় নেতারা সারাদিন আর এস এস-বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিরুদ্ধে কালো ব্যাজ পরে স্লোগান দিয়ে ঘুরে বেড়ান। আর সন্ধ্যাবেলা সেই নেতারা বাড়িতে তাদের আমন্ত্রণে যেতেই মিষ্টি এনে উল্লাসে ফেটে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে, এতদিনে একটা কাজের কাজ হয়েছে।' আমি হতবাক।

দেশের মানুষকে কোথায় নিয়ে এসেছে সরকারি মুসলিম তোষণ এবং পোষণ নীতি! পরিসংখ্যান বলছে, মুসলিম জনসংখ্যা শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে প্যান ইসলামিক চক্রান্ত মতো সরকারি নীতিতেই। আর তখনই শুরু হবে হিন্দু বিতাড়নের কাজ, যেমনটা হয়েছে কাশ্মীরে। হয়ে চলেছে বাংলাদেশে। পাকিস্তান হিন্দুশূন্য হয়েছে, বাংলাদেশ প্রায় হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গে 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান' তার হিন্দু ফুলটাকে ছিঁড়ে ফেলতে সময় লাগবে কি? পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে এই নিষ্ঠুর বাস্তবের সামনে এনে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সরকার। এই কালাপাহাড়ি নীতির জন্যই ভারতকে 'হিন্দুরাষ্ট্র' ঘোষণা করার দাবি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এরাজ্যেও।

বিঃ দ্রঃ— আনসার হোসেন খান

ইউ এন ও-তে একসময় পাকিস্তান পক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মসচিব। ভারত-পাকিস্তান তর্ক-বিতর্কের বিষয়ে ওয়াকিবহাল। ১৯৮৭ সালে অবসর নেবার পর তিনি ভারতের নাগরিকত্ব প্রার্থনা করেন ও নাগরিকত্ব নিয়ে ভারতে চলে আসেন। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে উচ্চপদের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেই তাঁর ভারতে আসা। ভারতে মুসলিমদের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষায় মুসলিমদের যে ভারতীয়দের সহযোগিতা করা উচিত তার জন্য তিনি ঐতিহাসিক পট ব্যাখা করেন। তাঁর লিখিত বই Rediscovery of India : Orient Longmans একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী গ্রন্থ। তাঁর মতে, ভারত হিন্দুরাষ্ট্র হলেই বরং মুসলিমরা উপকৃত হত।

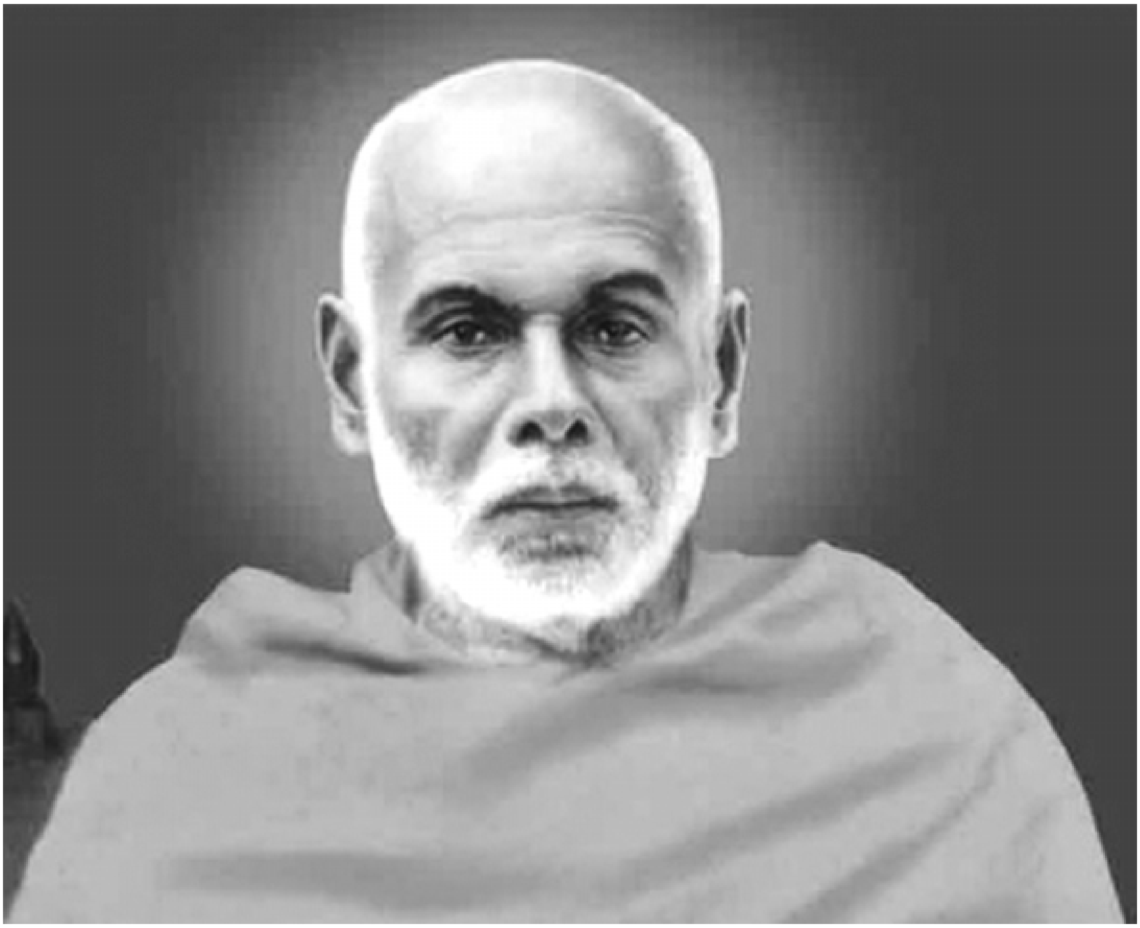

‘ওরু জাতি, ওরু মতম্, ওরু দৈবম্ মনুষ্যানু

শ্রীনারায়ণ গুরু এবং হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন

রবি রঞ্জন সেন

পরিব্রাজকরূপে ভারতবর্ষ ভ্রমণকালে স্বামী বিবেকানন্দ যখন কেরলে এসেছিলেন, তখন সেখানকার সেই যুগের সমাজব্যবস্থা দেখে তিনি তৎকালীন কেরলকে পাগলা গারদ আখ্যা দিয়েছিলেন। কারণ, তখনকার দিনে কেরলে হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে প্রবল জাতিভেদ ছিল। শহরে বা গ্রামে প্রত্যেক জাতি বা জাতিগোষ্ঠীর বসবাসের জন্য পৃথক এবং নির্দিষ্ট এলাকা ছিল, উচ্চবর্ণের ব্যক্তির

সঙ্গে অন্য জাতির ঠিক কতটা দূরত্ব বজায় রাখতে হবে তার নিখুঁত মাপজোক ছিল। অর্থাৎ কামার, লোহার, চর্মকারদের ২৪ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হতো, তিয়াদের ৩৬ ফুট, পুলয়ান বা চেরুমল কৃষকদের ৪৮ ফুট এবং সর্বাধিক পারিয়াদের ৬৪ ফুট। এই সমস্ত নিম্নবর্গীয় জাতির মানুষেরা উচ্চবর্ণের পাড়ায় প্রবেশ করতে পারত না, রাস্তায় চলার সময় কোনো উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ দেখলে তাদের রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াতে হতো। উচ্চবর্ণের মন্দির, পুকুর বা জলকূপ ব্যবহারের অধিকার তাদের ছিল না। আজকে আমাদের কাছে অবাস্তব এবং হাস্যকর মনে হলেও উনবিংশ শতাব্দীর কেরল 'শিব ঠাকুরের আপন দেশ'-এ এই সমস্ত উদ্ভট নিয়মকানুন সমাজে মেনে চলা হতো।

হিন্দু সমাজের এই অভ্যন্তরীণ বর্ণবৈষম্য এতই তীব্র ছিল যে উচ্চবর্ণের এবং নিম্নবর্ণের উপাস্য দেবদেবীও অনেক সময়ে ভিন্ন হতো। নিম্নবর্ণীয়রা শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা ছাড়াও বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর উপাসনা করত। তাদের মন্দির পৃথক ছিল, যেখানে তারা পশুবলি প্রভৃতি প্রথার মাধ্যমে ভদ্রকালী বা অন্যান্য ভয়ঙ্কররূপী দেবদেবীর পূজা করত। উচ্চবর্ণদ্বারা নিয়ন্ত্রিত কেরলের বিখ্যাত মন্দিরগুলি যেমন গুরুবায়ুর বা পদ্মনাভস্বামী মন্দিরে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা থেকে পালিয়ে বিদেশি ধর্মমত গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা যেতে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রটেস্টান্ট মিশনারিদের আগমনের কাল থেকেই। ব্রিটিশ শাসন, পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং হিন্দু সমাজ ও ধর্মের উপর মিশনারিদের ক্রমাগত কুঠারাঘাত এই সবকিছুর ফলে কেরলের হিন্দু সমাজ ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে যার হাত ধরে কেরলে হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে নতুন শক্তি সঞ্চয় হয়, সমাজ সংস্কার সাধিত হয়, জাতিভেদ প্রথা অনেকাংশেই দূরীভূত হয়, শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তের অমোঘ বাণী স্বামীজীর 'প্র্যাক্টিকাল বেদান্ত'র রূপ ধারণ করে হিন্দু সমাজকে নতুন করে একতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের মন্ত্র শেখায়, সেই ব্যক্তি হলেন শ্রীনারায়ণ গুরু। ২০ আগস্ট ১৮৫৪ সালে তিরুবনন্তপুরমের কাছেই চেম্পাঝান্তি নামে একটি গ্রামে (বর্তমানে শহরের ভিতরেই) ঈড়াবা (উচ্চারণানুসার বানান, মতান্তরে ইঝাবা) জাতির একটি পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাবা-মা তাঁকে নাম দেন নানু, যা নারায়ণের সংক্ষিপ্ত রূপ। বাল্যকালে তিনি মালয়ালম ও সংস্কৃততে শিক্ষালাভ করেন। বালক নানু প্রতিদিন গ্রামের একটি মন্দিরে পূজা করতেন, ধ্যান করতেন এবং সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করতেন। তাই বালক নানুকে গ্রামের লোকে নানু ভক্তন বলে ডাকত।

নানু যে ঈড়াবা জাতিতে জন্মেছিলেন, সেই জাতি নিম্ন বা তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' জাতির মধ্যে উচ্চতম। এদের স্পর্শে উচ্চবর্ণরা অপবিত্র হতো বলে মনে করা হতো। উচ্চবর্ণের মন্দিরে এদের প্রবেশাধিকার ছিল না এবং নাম্বুদ্রির ব্রাহ্মণদের থেকে এদের ৩২ ফুট দূরে থাকতে হতো, অথচ এই ঈড়াবারাই কেরলের জনসংখ্যার নিরিখে সর্ববৃহৎ জাতি। কেরলের প্রায় বিশ শতাংশ জনসংখ্যা এই জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং তথাকথিত অস্পৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও এরা কেরলের অনেক অঞ্চলে যথেষ্ট শক্তিশালী ও প্রভাবশালী গোষ্ঠী ছিল। এই জাতির মধ্যে অনেকে ধনবান ব্যক্তি এবং জমিদারও ছিল। যদিও এদের পারম্পরিক কর্ম খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করা, কিন্তু এদের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার পরম্পরাও ছিল, এদের মধ্যে অনেকে প্রসিদ্ধ বৈদ্য (আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক), জ্যোতিষী, শিক্ষক এবং সংস্কৃত বিদ্বানও ছিলেন।

নারায়ণ গুরুকে একুশ বছর বয়সে উচ্চশিক্ষার জন্য গুরুগৃহে পাঠানো হয়; সেখানে তিনি ব্যাকরণ, ন্যায় ও বেদান্তদর্শনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। সংস্কৃত শিক্ষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে এসে শিক্ষকতা করেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্মীয়স্বজনরা জোরপূর্বক তাঁর বিবাহ দেয়। কিন্তু অল্পদিনেই তিনি সাংসারিক জীবন ত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে তিনি বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তি জগতে জন্মগ্রহণ করেছে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। তাই আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি তা আমাকে পূর্ণ করতেই হবে।' এই সময়ে তিনি গৃহত্যাগ করে পরিব্রাজক জীবন প্রারম্ভ করেন। বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণকালে তিনি সেই যুগের উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় মহাপুরুষদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন চট্টম্পি স্বামী, যিনি সমকালীন কেরলের অত্যন্ত প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছিলেন এবং এই চট্টম্পি স্বামী নারায়ণ গুরুকে সাধনমার্গ ছাড়াও সামাজিক সংস্কারে উদ্বুদ্ধ করেন। অনেকে মনে করেন যে, চট্টম্পি স্বামী তাঁর গুরু ছিলেন। যদিও এই বিষয়ে মতান্তর আছে। আরেকজন উল্লেখযোগ্য আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন থৈকটু আয়াবু, যাঁর কাছে তিনি যোগ শেখেন। এঁকেও অনেকে তাঁর গুরু বলে মনে করেন যদিও এই সময়ের ঘটনাগুলি আমাদের কাছে অনেকটাই অস্পষ্ট। কন্যাকুমারীর নিকট মরুত্বমালা নামক পাহাড়ে গিয়ে সেখানে তিনি কঠিন তপস্যা শুরু করেন। এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর তাঁর জীবনের অবধূত পর্ব শুরু হয়। তখন তিনি ছেঁড়া কাপড় পরে, ধুলোমাখা শরীরে কেরলের গ্রামে গ্রামে বেরোতেন, গরিব গ্রামবাসীরা যা খেতে দিত তাই খেয়ে এবং পথের ধারেই বিশ্রাম করে দিন কাটাতেন। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে দক্ষিণ ভারতের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র, অস্পৃশ্য মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, পাওনা-বঞ্চনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বলা

যেতে পারে যে এই সময়টা তাঁর পরবর্তী জীবনের সামাজিক এবং ধর্মীয় সংস্কারসাধনের কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতিপর্ব ছিল।

আধ্যাত্মিক গুরু এবং সমাজ সংস্কারক হিসাবে নারায়ণ গুরুর সক্রিয় সময়কাল ১৮৮৮ থেকে ১৯২৮। বলা হয় যে, তাঁর জীবনের প্রথম তিন দশক তাঁর নির্দিষ্ট কর্মের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে তিনি অতিবাহিত করেন এবং পরবর্তী চার দশক সময়কাল ধরে তিনি কেরলের হিন্দু সমাজের খোলনলচে এমনভাবে পাল্টে ফেলেন যা এই সময় অভাবনীয় ছিল।

তাঁর সমাজ সংস্কারের সূত্রপাত ঘটে যখন তিরুবনন্তপুরমের ১৫ মাইল দক্ষিণে নৈয়র নদীর তীরে আরুবিপুরম নামক স্থানে প্রচলিত সামাজিক মতবাদ ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি একটি শিবমন্দির নির্মাণ করেন। সমাজের গোঁড়া অংশ প্রশ্ন তোলে যে অস্পৃশ্য ঈড়াবা হয়ে তিনি কীভাবে সেখানে শিবকে স্থাপন করলেন। এরই প্রত্যুত্তরে তাঁর বিখ্যাত এবং বহুল উদ্ধৃত উক্তি, 'আমি যাঁকে স্থাপন করেছি তিনি ব্রাহ্মণদের শিব নন, তিনি ঈড়াবা শিব।' এই মন্দিরের গাত্রে তিনি উৎকীর্ণ করেন—

'জাতির কোনো ভেদাভেদ ব্যাতীত
পন্থার হানাহানি ছাড়া
সকলে মিলে ভাইয়ের মতো বাস করে
এই আদর্শ স্থানে।'

সমাজ সংস্কার

এই মন্দির প্রতিষ্ঠা কেরলের দলিত বর্গের বিশেষ করে ঈড়াবাদের সামাজিক ন্যায়ের আন্দোলনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে। এই ছোট একটি প্রতীকী পদক্ষেপ এই বর্গের মধ্যে নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং স্বাভিমানবোধ জাগ্রত করে। এরপর দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি ষাটের অধিক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, যা লক্ষ লক্ষ দর্শন-বঞ্চিত মানুষকে হিন্দু মন্দিরে দর্শন ও পূজার অধিকার প্রাপ্ত করায়। এই সমস্ত মন্দিরে তিনি লৌকিক দেবদেবীর পরিবর্তে পৌরাণিক দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করেন, যার অধিকার থেকেও এতদিন পর্যন্ত নিম্নবর্ণরা বঞ্চিত ছিল। দ্বিতীয়ত, তিনি অস্পৃশ্য জাতির সন্ন্যাসীদের এইসমস্ত মন্দিরে পুরোহিত হিসাবে নিয়োগ করেন। তিনি মন্দিরের স্বচ্ছতা এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশ বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাঁর নির্মিত মন্দিরগুলির চারপাশে উদ্যান থাকত এবং গ্রন্থপাঠের জন্য পৃথক কক্ষ থাকত। তবে মন্দিরগুলির নির্মাণপদ্ধতি সহজ এবং অনাড়ম্বরপূর্ণ হতো। তিনি ভক্তদের বলতেন, মন্দির নির্মাণের উপর প্রয়োজনের অধিক অর্থব্যয় না করে বরং মন্দিরের চারপাশে বিদ্যালয়, গ্রন্থালয় এবং কুটীরশিল্প প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা তৈরি করতে।

আরুবিপুরমের এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত মন্দিরকে ঘিরে ক্রমে একটি মঠ তৈরি হয় এবং মন্দির ও ভক্তদের দেখাশোনার জন্য একটি সংস্থাও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থাই পরে বৃহৎ আকার ধারণ করে এবং ১৯০৩ সালে শ্রী নারায়ণ ধর্ম পরিপালন যোগম (বা এস এন ডি পি যোগম) নামে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯০৪ সালে নারায়ণ গুরু তিরুবনন্তপুরমের কুড়ি মাইল উত্তরে বারকালা বলে একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবেষ্টিত স্থানে শিবগিরি পর্বতে শিবগিরি মঠ নামে আরেকটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিবগিরি মঠে ১৯১২ সালে তিনি সারদা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, যা সহজ সরল স্থাপত্য রীতি এবং সরল অনাড়ম্বর পূজা পদ্ধতির জন্য আজও প্রসিদ্ধ।

এই সময়ে তিনি সমগ্র দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক বাণী প্রচার করেন। সংস্কৃত ও অদ্বৈত বেদান্তের পণ্ডিত, আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ এবং সমাজ সংস্কারক হিসাবে তাঁর খ্যাতি এই অঞ্চলে এবং দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ১৯১৩ সালে আলোয়ে নামক স্থানে তিনি আরেকটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন এবং সংস্কৃত ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা করেন। ১৯১৬ সালে তাঁর ষাটতম জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠান সমগ্র দক্ষিণ ভারত ছাড়াও তৎকালীন সীলন (শ্রীলঙ্কা) এমনকি কলকাতাতেও আয়োজন করা হয়।

১৯২১ এবং ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে শ্রীনারায়ণ গুরু সভাপতিত্ব করেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় আরেকজন সামাজিক সংস্কারক সহোদরন আয়াপ্পনের নেতৃত্বে নিখিল কেরল ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘ নামে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি সংস্থা স্থাপিত হয়। ১৯২১ সালে অদ্বৈত আশ্রমে অনুষ্ঠিত এই সংস্থার সম্মেলনে নারায়ণ গুরু জাতি নির্বিশেষে সহভোজন এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে সমাজকে আহ্বান করেন। যা তৎকালীন কেরলের পরিপ্রেক্ষিতে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। ১৯২৮ সালে সমস্ত ধর্মমতের একটি সম্মেলন আলোয়ের অদ্বৈত আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা চর্চার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন (ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরম্)। এখনও প্রতি বছর এই আশ্রমে শিবরাত্রির তিথিতে এই সর্বধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

নারায়ণ গুরুর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অঙ্গ ছিল মদ্যপান বিরোধী অভিযান। কেরলে এই সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। এর ফলে অনেকের জীবন, জীবিকা, পারিবারিক বন্ধন বিনষ্ট হচ্ছিল। ঈড়াবা জাতি পারম্পরিক ভাবে খেজুর রস সংগ্রহ করে মদ তৈরি করত। স্বাভাবিকভাবেই, এদের মধ্যে এই বদভ্যাসের হার অধিক ছিল। নারায়ণ গুরু এই নেশাকে কুষ্ঠরোগের সঙ্গে তুলনা করতেন এবং ঈড়াবাদের রস সংগ্রহের কাজ, মদ তৈরি এবং পান করা থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদন করতেন।

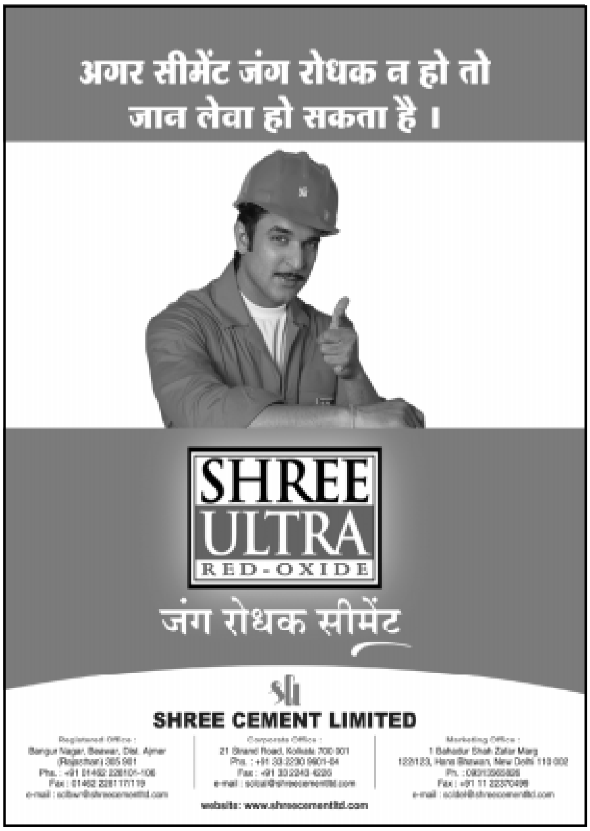

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ—

Usha Kamal

Kasat Marbles

19, R. N. Mukherjee Road
2nd. Floor, Kolkata - 700 001

Ph. No. Office : 2248-9947

Deals in : Marble, Granites Tiles, Ceramic Tiles, Stone etc.

Authorised Dealer of

KAJARIA CERAMICKS LTD.

'NAVEEN' brand tiles

REGENCY CERAMICES LTD.

BELLS CERAMICES LTD.

ORIENT TILES

Showroom :
32A, Tollygunge Circular Rd. kolkata - 53

Show Room - 24004154 / 24002858

Godown :
3, Tarpan Ghat Road. Kolkata - 53
(Mahabirtala, B. L. Saha Road)

Godown : 2403-4014

With Best Compliments From :

Wadhwana

"Park Center"

24, Park Street,

Kolkata - 700016

Phone :2229-8411/1031/4352

Fax : 91 33 2229-0492

e-mail : wadhwana@vsnl.com

সারা জীবন তিনি এর বিরুদ্ধে প্রচার করার ফলে এই জাতির মধ্যে মদ্যপানের হার অনেকটাই হ্রাস পায়।

শ্রী নারায়ণ গুরু প্রায় চল্লিশ বছর সময়কাল ধরে নিরন্তর জনগণের শিক্ষক, সংস্কারক এবং সংগঠক হিসাবে কাজ করেন। অসংখ্য মানুষ তাঁর দর্শনের জন্য আসতেন বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। কেউ কৌতূহল, কেউ শিক্ষালাভের জন্য, কেউ বা রোগের নিরাময়ের জন্য। বলা হয় যে, তিনি অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। অনেক মানুষের রোগভোগ দূর করেছিলেন। কিন্তু ভারতের সামাজিক ইতিহাসে তাঁর গুরুত্ব এই সমস্ত ঘটনার জন্য নয়, বরং কেরলের নিম্নবর্ণ এবং অস্পৃশ্য হিন্দুদের যে শৈক্ষিক, আধ্যাত্মিক এবং অর্থনৈতিক উত্থান তিনি ঘটিয়েছিলেন, সেটাই তাঁর জীবন এবং কর্মকাণ্ডের আসল অলৌকিকতা।

শিক্ষার প্রসার

শ্রী নারায়ণ গুরু তাঁর নিজের ঈড়াবা জাতি এবং কেরলের পিছিয়ে পড়া সমস্ত মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমস্ত মঠ মন্দিরের সঙ্গে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। ধনী ব্যক্তিদের তিনি আবেদন করতেন দরিদ্রদের পড়াশোনার জন্য অর্থদান করতে। মেধাবী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতেও তিনি প্রোৎসাহিত করতেন। তিনি মেয়েদের জন্যও সমান শিক্ষার সুযোগের পক্ষপাতী ছিলেন। যখন বিভিন্ন গ্রামে মানুষ তাঁকে মন্দির নির্মাণের অনুরোধ করত, তখন অনেক সময়েই তিনি তাদের বিদ্যালয় শুরু করতে বলতেন। এই অনুপ্রেরণার ফলেই ঈড়াবা জাতি শিক্ষালাভ করে নিজেদের উন্নতিসাধন করে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্থা শ্রী নারায়ণ ধর্ম পরিপালন যোগম্-এর তত্ত্বাবধানে সারা কেরল জুড়ে প্রচুর স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। কোল্লমে শ্রী নারায়ণ কলেজ আজ কেরলের উচ্চশিক্ষার জগতে একটি সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে কেরলের শৈক্ষিক ও সামাজিক জীবনে এস এন ডি পি যোগম্ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী একটি সংগঠন। এই সংস্থার বর্তমানে পঞ্চাশ লক্ষের উপর সদস্য এবং প্রায় দুই হাজার শাখা রয়েছে।

আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ছাড়াও নারায়ণ গুরু সংস্কৃত শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষার উপর খুব জোর দিতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমস্ত ধর্মীয় শিক্ষালয় গুরুকুলগুলিকে তদারকি করার জন্য তিনি 'গুরুকুল প্রতিষ্ঠানম্' গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্যালয় বারকালার কাছেই শ্রীনিবাসপুরমে স্থাপিত হয়। নারায়ণ গুরুর পর এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন নটরাজ গুরু এবং তারপর স্বামী নিত্য চৈতন্য যতি। এই সংস্থা বর্তমানে ইংরাজি এবং মালয়ালম উভয় ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করে এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ও বহির্বিশ্বে এর শাখা আছে।

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উত্থানের বিষয়েও তিনি যত্নশীল ছিলেন। বারকালার মঠের সঙ্গেই একটি তাঁত কেন্দ্র তিনি চালু করেছিলেন। ধনী ঈড়াবাদের তিনি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ করতেন, যাতে তার ফলে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান ঘটে। মঠ-মন্দিরের সঙ্গে কুটির শিল্প প্রশিক্ষণের ব্যাপারেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল।

ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সংস্কার

নারায়ণ গুরু অদ্বৈত বেদান্তবাদী ছিলেন এবং আমৃত্যু তিনি নিজেকে নিষ্ঠাবান হিন্দু মনে করতেন। তিনি কোনো নতুন দর্শন, মত বা পন্থা প্রতিষ্ঠা করেননি। হিন্দুধর্মকে যুগোপযোগী করার জন্য তিনি সমাজ সংস্কার ছাড়াও ধর্মীয় বিষয়েও বিভিন্ন সংস্কার সাধন করেন। প্রথমত, অব্রাহ্মণ এবং নিম্নবর্ণ হয়ে তিনি সাধারণ হিন্দু জনগণের জন্য মন্দির স্থাপন করেন ও অব্রাহ্মণ বিশেষ করে অস্পৃশ্য জাতির পুরোহিতদের সেই সব মন্দিরে পূজা-আর্চা করার জন্য নিয়োগ করতেন, যা গোঁড়াদের চোখে অপরাধ। অযথা দীর্ঘ এবং আড়ম্বরপূর্ণ পূজা পদ্ধতিকে তিনি সরলীকৃত করেন। আবার তাঁর প্রতিষ্ঠিত কিছু মন্দিরে বিগ্রহের পরিবর্তে অপর কোনো প্রতীক তিনি প্রতিষ্ঠা করতেন। যেমন, ত্রিশূরের একটি মন্দিরে 'আলো হোক' এই উক্তি করে বিগ্রহের স্থানে তিনি একটি বিশাল পিতলের তৈললম্ফ প্রতিষ্ঠা করেন। আবার আরেকটি মন্দিরে কোনো মূর্তি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা না করে ব্রহ্মরূপী আত্মার প্রতীক হিসাবে একটি বিশাল আয়না প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৯ সালে যোগম্-এর বার্ষিক সম্ভাষণে তিনি বলেন—

'এখন মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা সর্বত্রই অনুভব করা হচ্ছে। কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেশ্য কি পূর্ণ হচ্ছে? ঈশ্বরের আরাধনা মন্দিরে বদ্ধ না থেকে প্রতিটি ঘরে প্রতিটি মানব হৃদয়ে পৌঁছানো দরকার। এই উদ্দেশ্যে, ধর্মের মূল নীতিগুলি সকলেরই অবহিত হওয়া দরকার।'

বেদান্তের তত্ত্বকে ঘরে ঘরে নিয়ে যাবার জন্যই ১৯২৮ সালে তিনি শ্রী নারায়ণ ধর্ম সঙ্ঘম্ ট্রাস্ট নামে একটি সন্ন্যাসী সঙ্ঘ গড়ে তোলেন। এটি মূলত ধর্মীয় সংস্থা, বর্তমানে এর আঠাশটি শাখা আছে এবং ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে এই সংস্থার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

সাহিত্য রচনা

শ্রী নারায়ণ গুরু মালয়ালম, সংস্কৃত ও তামিল এই তিনটি ভাষায় বহু স্তোত্র, আধ্যাত্মিক টীকা, ব্যাখ্যা ও অনুবাদ রচনা করেন। ১৮৮১ সালে যখন তাঁর সামাজিক কর্মকাণ্ড শুরু হয় তখন থেকেই

তিনি আধ্যাত্মিক সাহিত্য রচনার কাজ শুরু করেন। মালয়ালম এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁর দৈবস্তুতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিনায়ক অষ্টকম্, বাসুদেব অষ্টকম্, ভদ্রকালী অষ্টকম্, শিব অষ্টকম্, সুব্রহ্মণ্য অষ্টকম্, দেবী স্তবম্, কালী নাটকম্, ব্রহ্ম বিদ্যা পঞ্চকম্, অদ্বৈত দীপিকা, অর্ধ-নারীশ্বর স্তোত্র, আত্মোপদেশ শতকম্ প্রভৃতি অসংখ্য অসাধারণ আধ্যাত্মিক সৃষ্টি।

এছাড়াও তামিল ভাষায় তিনি স্তুতি করেন এবং তামিল তিরু কুরলকে মালয়ালম ভাষায় অনুবাদ করেন। ঈশোপনিষদের মালয়ালম অনুবাদও তিনি রচনা করেন। এইভাবে বৈদিক ধর্মের মূল তত্ত্ব ও দর্শনকে তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় এই রচনাগুলির মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতের বিশেষ করে কেরল এবং তামিলনাড়ুর সাধারণ মানুষের কাছে তিনি নিয়ে যান। বিশেষভাবে, উচ্চবর্ণের সমাজ, মন্দির, পূজাপাঠ থেকে এযাবৎ বঞ্চিত তাঁর নিজের ঈড়াবা জাতি এবং অন্যান্য তথাকথিত নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য মানুষের কাছে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের বাণীকে তিনি পৌঁছে দেন।

ধর্মান্তরণ রোধ

সামাজিক বৈষম্যের কারণে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে অনেক ঈড়াবা খ্রিষ্টধর্ম এবং ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। এই সময় একদিকে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের মনে বহুযুগ ধরে চলে আসা ভক্তি ভালবাসা, অপরদিকে সাম্যের হাতছানি দেওয়া অন্যান্য ধর্মমতের প্রলোভন— এই উভয় আকর্ষণের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে যখন ১৯০৪ সালে ঈড়াবারা থিওসফিকাল সোসাইটির নেত্রী অ্যানি বেসান্তকে লিখিত একটি সম্বোধনপত্রে বলেন, আমরা শুনে খুব খুশি হয়েছি, আপনি খ্রিস্টান হয়ে জন্মেও হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আপনি যখন কোঝিকোড গিয়েছিলেন তখন সেখানকার রাজা জামোরিন-এর রাজপ্রাসাদে আপনাকে অতিথি হিসাবে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়, কারণ আপনি ধর্মান্তরিত হিন্দু। অথচ জন্মগতভাবে হিন্দু হয়েও আমাদের রাজপ্রাসাদের কাছে আসা নিষিদ্ধ। ফলে আমাদের যদি আপনার মতো প্রবেশাধিকার পেতে হয় তাহলে হয়তো তার একমাত্র পথ আমাদের আগে খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া এবং তারপর আপনার মতো আবার ধর্মান্তরণ করে হিন্দু হওয়া, তবে হয়তো আমরা এই বৈষম্য থেকে মুক্তি পাব।' বলা বাহুল্য, এই বক্তব্যের মধ্যে হিন্দু হয়ে জন্মেও তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ এবং দুঃখ লক্ষণীয়।

নারায়ণ গুরু বলতেন, মানবজাতির ধর্ম একটাই। যদিও তাঁর সঙ্গে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের প্রতিনিধিদের আলোচনা হতো। কিন্তু তাঁর লেখা বা বক্তব্যে তিনি এই সমস্ত ধর্মমত নিয়ে বিশেষ চর্চা করেননি। অবশ্য তিনি কোনো ধর্মমতের বিরোধিতা করেননি এবং সব ধর্মমতের মৌলিক উদ্দেশ্য এক অর্থাৎ মানুষের অভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন, বলেই তিনি মনে করতেন। এইটাই তাঁর 'ওরু মতম্' বা 'এক ধর্ম'— এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত অর্থ। এবং এই কারণেই তিনি কোনো মতের সমালোচনা না করেও ধর্মান্তরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। যখন ঈড়াবাদের একাংশ বৈষম্য দূর করার তাগিদে অন্য ধর্মে যাবার কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, তখন তিনি তাদের এই বলেই বোঝাতেন যে, ধর্ম পরিবর্তনই বাস্তবে অর্থহীন। কারণ আসলে সমস্ত মনুষ্যজাতির ধর্ম একটাই। বরং নিজের ধর্মে থেকে যে অধিকারগুলি থেকে তাঁরা বঞ্চিত সেই অধিকারগুলি কীভাবে ছিনিয়ে নেওয়া যায় এবং এইভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে হিন্দু ধর্ম ও সমাজে সাম্য আনা যায় সেই বিষয়ে তৎপর হওয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করতেন।

'ওরু জাতি, ওরু মতম্, ওরু দৈবম মনুষ্যানু'

শ্রী নারায়ণ গুরু রচিত বিখ্যাত কবিতা 'জাতি মীমাংসা'র দ্বিতীয় স্তবকের এই প্রথম পংক্তিটি তাঁর নামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। সমস্ত মনুষ্য এক জাতির, এক ধর্মের এবং এক ঈশ্বরের— এই উক্তিটি নারায়ণ গুরুর মতাদর্শের সারতত্ত্ব বলে ধরা হয়। আরেকটি কবিতা 'মত মীমাংসা'তে তিনি তাঁর 'ওরু মতম্' বা 'এক ধর্ম'র ধারণার কথা বলেন।

নারায়ণ গুরুর জীবন, সাধনা এবং কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁর খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বারকালায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিবগিরি মঠে পদার্পণ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধী। রবীন্দ্রনাথ ১৯২২ সালে গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর বলেন যে, তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) বহু দেশে যাত্রাকালে বহু ঋষি মহর্ষিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে থাকলেও অধ্যাত্মমার্গে নারায়ণ গুরুর সমতুল্য কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎ তিনি পাননি।

মহাত্মা গান্ধী ১৯২৪ সালে বাইকম সত্যাগ্রহের সময় কেরলে আসেন এবং তিনিও বারকালা গিয়ে নারায়ণ গুরুর সাক্ষাৎ করেন। কেরলের ইতিহাসে বিখ্যাত এই বাইকম সত্যাগ্রহ তথাকথিত অস্পৃশ্যদের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশাধিকারের আন্দোলন ছিল। জাতিভেদ এবং বর্ণপ্রথা সম্পর্কে নারায়ণ গুরু এবং মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে কিছুটা মতের অমিল ছিল, যদিও অস্পৃশ্যতা নিবারণ সম্বন্ধে দুজনেই একমত ছিলেন। তবে মন্দির প্রবেশের এই আন্দোলন সম্পর্কে নারায়ণ গুরু কংগ্রেসের সঙ্গে কিছুটা দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। কংগ্রেসের অহিংস সত্যাগ্রহকে অধিক নরমপন্থী বলে তিনি মনে করেন এবং আরও তীব্র প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকদের উচিত প্রয়োজনে ব্যারিকেড টপকে বা ভেঙে মন্দিরে প্রবেশ করে সকলের

সঙ্গে এক পংক্তিতে প্রসাদ গ্রহণের জন্য এগিয়ে যাওয়া।

এই সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলেও জাতিভেদ দূরীকরণের জন্য আন্দোলন চলছিল। ইতিপূর্বেই মহারাষ্ট্রে জ্যোতিবা ফুলে এবং সাবিত্রীবাঈ ফুলে এই প্রয়াস করেছিলেন। পরবর্তীকালে বাবাসাহেব আম্বেদকরের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আজকে বহুল প্রচারিত। এই সময়েই তামিলনাড়ুতে ই ভি রামস্বামী নাইকর বা পেরিয়ার জাস্টিস পার্টি গঠন করে আন্দোলনে নেমেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য আন্দোলনগুলি অনেকাংশেই রাজনৈতিক ছিল, তবে নারায়ণ গুরুর আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। এর কোনো রাজনৈতিক দিক ছিল না। অন্যান্য কিছু আন্দোলনের সঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য যে পেরিয়ার বা আরও কিছু এই ধরনের আন্দোলন জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করতে গিয়ে হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি ও হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধিতা করে। কিন্তু নারায়ণ গুরুর সমাজ সংস্কার আমাদের দেখিয়েছে যে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরোধিতা করার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং হিন্দুধর্ম, হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুদর্শন থেকেই এই লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। উপনিষদের আধ্যাত্মিকতা ও অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনকে পাথেয় করেই ব্যবহারিক জগতে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগঠিত করা যায়।

নারায়ণ গুরুর প্রদর্শিত পথে সমাজ সংস্কার এবং সামাজিক আন্দোলনের কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান তাঁর শিষ্য এবং সহযোগী ডা: পাল্পু এবং কূমারন আসন। আধ্যাত্মিক জগতে তাঁর পরম্পরার উত্তরাধিকারী হন নটরাজ গুরু এবং পরবর্তীকালে নিত্য চৈতন্য যতি। তাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্বে সাংগঠনিকভাবে এই আন্দোলন আরও দৃঢ় হয়, যদিও যে কোনো বৃহৎ সামাজিক আন্দেলনের মতোই নারায়ণ গুরুর দেহাবসানের পর এই আন্দোলনেও অনেক সময়েই অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য ও মতবিরোধ দেখা দেয়। ১৯২৮ সালে কেরলের এই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তি, দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সমাজের নবজাগরণের কাণ্ডারি শ্রী নারায়ণ গুরু পার্থিব দেহ ত্যাগ করেন এবং তাঁর প্রিয় বারকালা মঠেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত চারটি স্থান অর্থাৎ পৈতৃক ভিটে ও জন্মস্থান চেম্পাঝান্তি, প্রথম শিবমন্দির প্রতিষ্ঠান স্থান আরুবিপুরম্, আলোয়েতে অদ্বৈত আশ্রম এবং প্রধান কর্মস্থল ও সমাধিক্ষেত্র বারকালা, আজ অগণিত ভক্ত ও গুণগ্রাহীদের কাছে তীর্থক্ষেত্র।

আমরা বাঙালি পর্যটকরা ঝাঁকে ঝাঁকে কেরলে যাই সমুদ্রতট এবং 'ব্যাকওয়াটর' উপভোগ করার জন্য, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যদি আমরা এই স্থানগুলির দর্শন করি, তাহলে হয়তো কেরলের সামাজিক ইতিহাস, জাতিভেদ দূরীকরণ এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াই ও নারায়ণ গুরুর অবদান সম্পর্কে আরও ভালভাবে অনুধাবন করতে পারব। বিশেষ করে বারকালা মঠের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্ত আধ্যাত্মিক পরিবেশে গাত্র অবগাহন করে আমরা নিজেদের বৌদ্ধিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে আরও সমৃদ্ধ করতে পারব।

Kedia Fabrics

Kamal Kumar Kedia

Mfg. & Dealer of Fancy Sarees

160, Jamunalal Bazaz Street, 2nd Floor,

Kolkata-700 007 (s) 2272-5487

Mob : 9331105467

TRADE CENTRE (INDIA)

37, Lenin Sarani
Kolkata - 700 013

e-mail : t.c.india@vsnl.net

Fax : 91-33-2249, 8706

Ph. : 2249-8722

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

A Well Wisher

K 3N LIFESTYLES

With Best Compliments:-

Anderson Wright International

৫ বছরের
গ্যারান্টী

ISI-2347

নির্মাতা

KUMAR PLASTICS PVT. LTD.

১৯২, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০ ০০১
ফোন ঃ ২২২১-১৯৫১, ২২৪২-১৯৩০, ২২৪২-৫৪১০

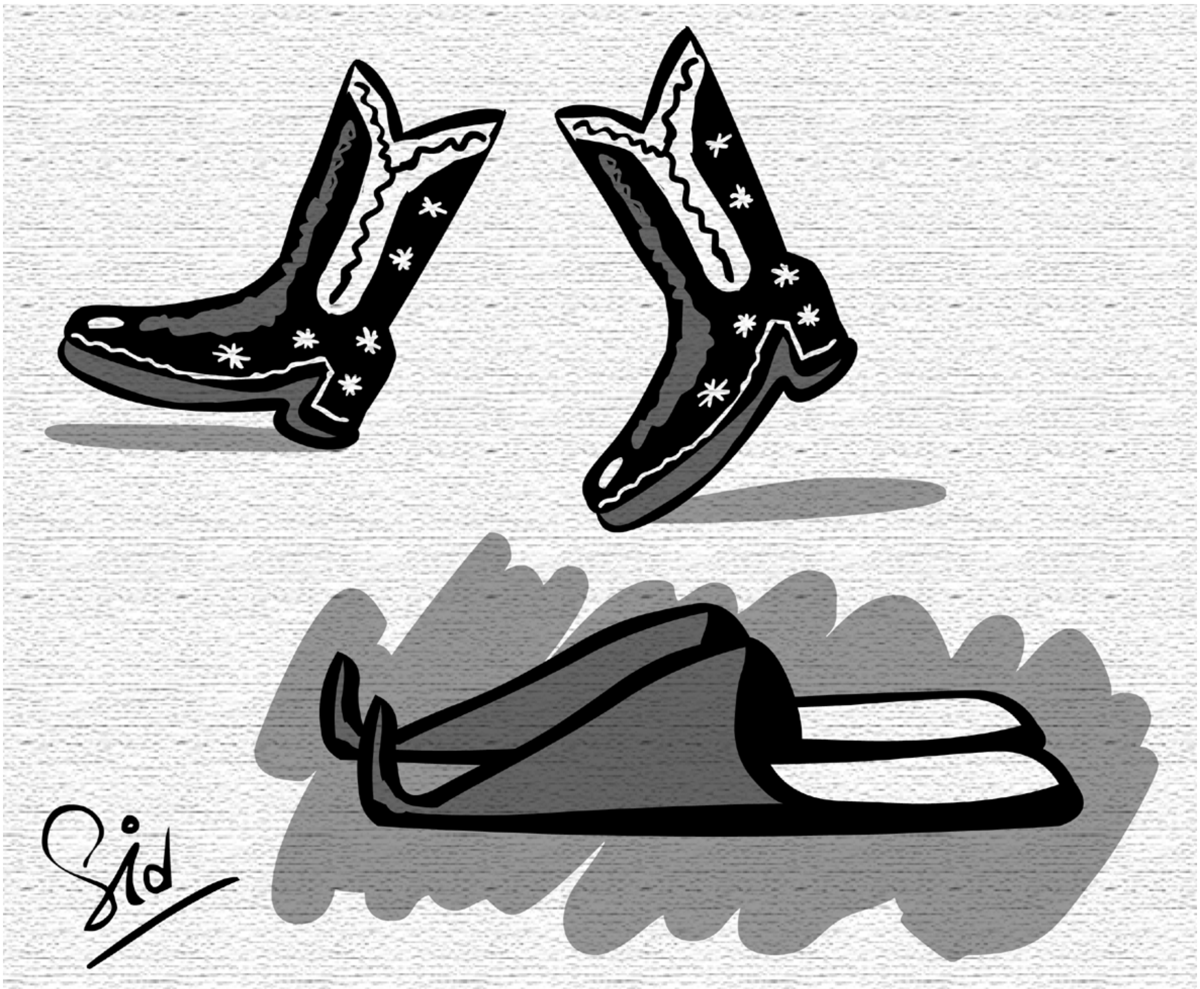

পুজোয় পরুন পুরনো জুতো

সুন্দর মৌলিক

পুজো সংখ্যা মানেই তো পুজো। আর এবার পুজোয় নতুন জুতো পরতে পারেন, কিন্তু সঙ্গে ফ্রিতে পরুন পুরনো জুতো।

পুজোর মুখে জুতো নিয়ে লেখার ইচ্ছা ছিল না, জানেন। কিন্তু অঘটন থেকেই এই ঘটনা মানে আমার জীবনের ছোট্ট একটা ঘটনা থেকেই এমন বড় একখানা লেখা বিজবিজ করল মাথায়। সাধারণ ঘটনাকে অসাধারণ করে দেখানো আমার অভ্যাস। আগে মানতাম না। সবার সমালোচনা শুনতে শুনতে এখন বুঝেছি অসাধারণ করে দেখানোটাই আমার সাধারণ অভ্যাস।

ঘটনাটা সত্যিই সাধারণ, অতি সাধারণ। সবার জীবনেই ঘটে। সেই সাধারণ ঘটনাটি হল সম্প্রতি আমার এক জোড়া চপ্পল চুরি হয়েছে। হারিয়ে ফেলেছিও বলতে পারতাম। কিন্তু এতকাল ধরে যা শুনে এসেছি, তাতে জুতো চটি কেউ হারায় না। জুতো-চপ্পলরা সবাই চুরি হয়। কুকুরে

নিয়ে গেলেও সবাই বলে চুরি গেছে। প্রশ্ন ওঠে, কুকুর কেন জুতো নেবে? চার পায়ে এক জোড়া জুতোয় কী হবে? যাই হোক, এক জোড়া চপ্পল চুরির অভিজ্ঞতা অনেক। আমার সেই চপ্পলটিও যে খুব অসাধারণ তেমনটা বলব না। খানতিনেক পেরেকওয়ালা দু-দুবার মুচির হাত ঘুরে আসা চপ্পল জোড়ায় কোনোদিন কালিও পড়েনি। মাঝেমধ্যে পেরেকের খোঁচা দিয়ে বিদ্রোহ প্রকাশ করলেও রোদে, জলে, কাদায় দীর্ঘদিন সে সঙ্গ দিয়েছে। বিপ্লব-বিদ্রোহ দূরের কথা, 'আর আমারে পায়ের তলায় দাবায়ে রাখতে পারবা না' বলে কোনোদিনও উষ্মা প্রকাশ করেনি।

এমন এক দীর্ঘদিনের চরণ-বন্ধুকে স্মরণ না করে পারছি না। যেখানে ছেড়ে রেখেছিলাম সেখানে অনেক অনেক সুন্দর জুতো ছিল। তবু কে যে আমারটিতে পা গলাল কে জানে। তবে যেই গলাক সে জানে না অপরের জুতোয় পা গলানো যে কত বিপদ! সেকথা না হয় পরে বলা যাবে, কিন্তু আমার জুতোর শোক আমি ভুলতে পারিনি। আর সেই শোক প্রকাশের মধ্যেই এক বন্ধু এক বড় আবিষ্কারের কাহিনি জানালেন। শিখিয়েও দিলেন। সেটি এই শতাব্দীর বড় আবিষ্কার। যা করলে কক্ষনও জুতো চুরি হবে না। নাকি হতেই পারে না। আপনাদেরও সেটা আজ শিখিয়ে দেব। তবে নতুন কিছু হুটপাট করে শেখা ভালো নয়। রয়ে সয়েই শেখা ভালো। জুতো হারালেও ভুলো মন নই আমি। সুতরাং, চিন্তা নেই, ঠিক মনে করে সার সত্যটি জানিয়ে দেব। একটা জুতোর গল্প মনে পড়ে গেছে, সেটা বরং আগে বলে নিই।

এক মেয়ে জুতোর দোকানে গেছে। এটা সেটা অনেক জুতো দেখার শেষে পছন্দও হয়ে গেছে। দোকানদার ঘাম মুছে জুতো প্যাক করছেন যখন, ঠিক তখনই সেই মেয়ে জানাল, এই রে পয়সা আনতেই যে ভুলে গেছি। দিয়ে দিন আমি পরে এসে দিয়ে যাব। দোকানদার মশাই প্যাকিং বন্ধ রেখেছিলেন। সবটা শুনে ফের প্যাকিং করলেন এবং দিয়ে দিলেন। মেয়ে খুশিতে জুতোর ব্যাগ দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেল।

কাণ্ড দেখে পাশের দোকানদার অবাক হয়ে বলল, এইভাবে অচেনা মেয়েটিকে বিশ্বাস করাটা কি ঠিক হল? যদি সে আর না আসে! জুতোর দোকানদার হাসতে হাসতে বলল, ও মেয়ে বাড়িতে গিয়েই ফিরে আসবে। আমি দুই মাপের দুটি জুতো দিয়েছি।

না, এটাকে জুতো চুরির ঘটনা ভাববেন না। আর শুরুতেই মেয়ে ক্রেতা জব্দ হওয়ায় পাঠিকারা রাগ করে পড়া থামাবেন না যেন। দেখুন জুতোর যত্ন মেয়েরাই ভালো জানে। যদিও পরিসংখ্যান বলে, রাস্তায় বেরিয়ে মেয়েদের জুতোই বেশি ছেঁড়ে। আসলে সুকুমার রায় তার শিশু সহিত্যে যে গল্প লিখেছিলেন তার নাম ছিল 'যতীনের জুতো'। যতীন যেহেতু ছেলে তাই জুতোর যত্ন না নিলে যে কী পরিণাম হয় তা সেখানেই ছেলেরা শিখে নেয় ছেলেবেলায়। যতীনকে দেওয়া সেই মুচি আর দরজিদের উপদেশের কথা কোনোও ছেলেই ভুলতে পারেনি।

আপনার আমার ছেলেবেলা তো এই সেদিনের কথা। জুতোর ইতিহাস কিন্তু অনেক প্রাচীন। মানুষ যবে থেকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় তবে থেকেই আসলে জুতোর উপরে দাঁড়িয়েছে। আবার জুতো তৈরিও এমনি এমনি নয়। মানুষের পায়ের গঠন আর সেই পা যেখানে বিচরণ করবে তার গঠনও জুতোকে বদলে নিয়ে চলেছে। আমরা যে স্যান্ডেল পরি, সেটা কিন্তু সব দেশে নয়। এশিয়া এবং আফ্রিকাতেই স্যান্ডেলের ব্যবহার বেশি। বাকি বিশ্বের বেশিরভাগ অঞ্চলেই চামড়ায় মোড়া জুতোই বেশি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঠিক কবে থেকে এই জুতোর ব্যবহার, তা জানতে গেলে আমাদের অনেকটা পিছনে তাকাতে হবে। প্রাচীন স্পেনের গুহায় ১৫ হাজার বছর আগের কিছু গুহাচিত্র নাকি রয়েছে, যাতে দেখা যায় আদিম মানুষের পায়ে পশুর চামড়া জড়ানো ছিল। নিজে চোখে দেখিনি, তাই 'নাকি' বললাম। চামড়া ছাড়াও খড়, কাঠের জুতো পরা গুহাচিত্রও দেখা যায়। জাপানের প্রাচীন মিথ সাহিত্যেও কাঠের জুতোর ব্যবহার ছিল বলে জানা গেছে।

বর্তমানে যে জুতো আমরা ব্যবহার করি তা দীর্ঘ বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এসেছে। একেবারে বাঁদর থেকে মানুষ হওয়ার মতো। মনে রাখতে হবে, জুতো পায়ে থাকলেও এর মর্যাদা মুকুটের মতো। জুতো গবেষকরা বলেন, ইউরোপের কিছু অঞ্চলে জুতো ছিল স্রেফ রাজাদের পরিধানযোগ্য। কোনো প্রজা জুতো পরিধান করলে তার পিঠে শুধুই জুতো পড়ত না, রাজার আদেশে হত্যা পর্যন্ত করা হতো। এশিয়াতেও একই ঘটনা আমরা দেখতে পাই ভিন্ন দৃষ্টিতে। এশিয়াতেও রাজন্যবর্গের রাস্তায় সাধারণ মানুষের জুতো পায়ে হাঁটা নিষিদ্ধ ছিল। এদেশেও সে ব্যবস্থা ছিল। তারই স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে রাজধানী দিল্লির আলাদা নামের দুই পথ— রাজপথ, জনপথ।

তবে জুতো পরা আর পেটানোটা বরাবর একই জুতো দিয়ে করা হয়েছে। এর জন্য আলাদা আলাদা জুতো তৈরির কথা কখনো মনে হয়নি। কারণ, পায়ের জুতো হাতে না উঠলে যে মারায় কোনো সুখ নেই। ওখানেই তো অপমানটা লুকিয়ে রয়েছে। তবে অপমান সবার

সমান নয়। একটা গল্প মনে পড়ছে।

প্রথম বন্ধু ঃ তোকে বারবার মানা করার পরেও তুই পাশের বাড়ির মুরগি চুরি করলি, এখন যে তোকে জুতো পেটা করবে রে। তোর মান-সম্মান কী আর থাকবে?

দ্বিতীয় বন্ধু ঃ ইস্! আমার মান-সম্মান এত কম নাকি যে জুতো দিয়ে দু-চারটে মারলেই চলে যাবে? কতদিন পর একটু মুরগির ঝোল খেলাম বল!

এবার জুতোর সম্মানের কথা বলা যাক। এতকাল জুতো শুধু পায়ে পরেছি। এবার জুতো চুরির পরে জুতো নিয়ে পড়তে গিয়ে দেখা গেল এতকাল যাকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখেছি তার গর্ব কথাও কম নয়।

মেয়েরা আজকাল খুব হাই হিল জুতো পরে। কোনো কোনোটা আবার পেনসিল হিল। কিন্তু শুরুতে এটা ছিল পুরুষের পছন্দ। জুতোর ইতিহাস বলছে, হাইহিল জুতোর প্রচলন হয় ফ্রান্সে। ষোড়শ লুই প্রথম হাইহিল জুতোর প্রচলন করেন। সেই সময়ে ফরাসি রাজপরিবার দেশের মানুষের উপরে হাইহিল জুতো পরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। উঁচু হিল তখন উঁচু মানুষের, উঁচু বংশের। এমন কী হাইহিল জুতো নিয়ে ফ্রান্সে ছোটখাটো বেশ কয়েকটি যুদ্ধও হয়েছিল এবং তাতে অনেক রক্ত ঝরে, প্রাণ যায়। হিলের দাবিতে যুদ্ধ! ভাবা যায়! সেও তো এক শ্রেণী সংগ্রাম নয়! পরবর্তী সময়ে লন্ডনের রাজপরিবারেও উঁচু হিলের জুতো ঢুকে পড়ে। যথারীতি সেই জুতোও ছিল জনসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ।

শুধু হাইহিল জুতো নয়, পাতি স্যান্ডেল নিয়ে কম লড়াই হয়নি। আপনি আমি যে পয়সার অভাবে স্যান্ডেল পরে চটাস, চটাস করে ঘুরি তারও এক সময়ে রাজকীয় সম্মান ছিল। ইতিহাস বলছে, স্যান্ডেলের ব্যবহার শুরু হয় মিশরে। মিশরের ফারাও রাজারা স্যান্ডেল পরিধান করে রাজকর্ম পরিচালনা করতেন। ফারাও ব্যতীত অন্য কেউ স্যান্ডেল পরতে পারত না।

পদ মানে পা। আবার পদ মানে দায়িত্ব, পরিচয়, সম্মান। কে কোন পদে তার উপরেই সমাজ তার জন্য সম্মান ঠিক করে রাখে। আর সেই পদাধিকারীর পদসেবায় যে পাদুকা তারও তো সম্মান থাকতে হবে নাকি!, মুড়ি-মিছরি এক দর হলে চলবে কেন? একদিন পথের কর্কশতা থেকে পদযুগলকে রক্ষা করার জন্য যে জুতো ব্যবহার শুরু হয়, তাই একদিন হয়ে ওঠে স্ট্যাটাস সিম্বল। আধুনিক কালে আবার উল্টো রীতিও চালু রয়েছে। বড় বড় পদাধিকারীরা সাধারণকে 'আমি তোমাদেরই লোক' বার্তা দিতে স্যান্ডেল চপ্পল, হাওয়াই চপ্পল পরেন। হাতে বহুমূল্য আইফোন, আইপ্যাড, ট্যাবলেট নিয়ে বিমানের এক্সিকিউটিভ ক্লাসে ভ্রমণ করা মানুষও হাওয়াই চপ্পল ব্যবহার করেন।

ইতিহাসে আরও মজার মজার গল্প রয়েছে। উত্তর আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান জাতিগোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজনেই ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য একরকম জুতো তৈরি করে 'মোকাসিন' নাম দিয়েছিল। কিন্তু সেই মোকাসিন বেশিদিন সাধারণের পায়ে থাকতে পারেনি। ইউরোপে রানি এলিজাবেথের সময়ে আইন করে বলা হয়, 'কেউ যদি জুতো বানাতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই ৫১ ইঞ্চি জুতো তৈরি করতে হবে। এই দৈর্ঘ্য প্রস্থের বাইরে জুতো তৈরির অধিকার একমাত্র রাজপরিবারের। আবার রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ড নাকি এমন আইন করেন যে জুতোর দৈর্ঘ্য হতে হবে পদমর্যাদা অনুযায়ী। অর্থাৎ সবচেয়ে বড় জুতো পরার অধিকার হলো রাজার নিজের। এসবকে কী বলবেন? জুতোর রাজতন্ত্র না রাজার জুতোতন্ত্র!

বুঝতেই পারছেন, জুতো ব্যাপারটা এলেবেলে নয়। পায়ে থাকলেও সে ইতিহাস বইতেও থাকে। রাজপরিবারের ইতিহাসেও থাকে। আর সেই জুতো আবিষ্কার নিয়ে দাবিরও অন্ত নেই। আপনি যদি হবু চন্দ্র রাজা আর গবু চন্দ্র মন্ত্রীর আমলে জুতো আবিষ্কার ভেবে থাকেন তবে নিতান্তই ভুল করবেন। রবি ঠাকুর অমন একটা জম্পেশ কবিতা লিখেই বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, জুতোকে সোজা করে পরা ছাড়া উপায় না থাকলেও জুতো বাবাজি অত সোজা ব্যাপার নয়। সেই যে মনে আছে তো একদিন রাজা হবুচন্দ্র মন্ত্রী গবুকে ডেকে বললেন—

কহিল হবু, শুন গো গবুরায়
কালিকে আমি ভেবেছি সারা রাত্র—
মলিন ধুলা লাগিয়ে কেন পায়

রবি ঠাকুরের কলমে শেষে একটা সমাধান এল—

ধুলার মাঝে না যদি দেন পা
তাহলে পায়ে ধুলা তো লাগে না।

এ পৃথিবীতে কবে আর কী সাধারণের জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে! সবই তো রাজা-উজিরদের জন্য। জুতোর ক্ষেত্রেও তাই। রাজার পায়ে ধুলো লাগবে, এটা কি কোনো ধম্ম কথা হতে পারে! পারে না। তাই পণ্ডিতেরা নিদেন দিলেন, গোটা পৃথিবীটাকেই না হয় মুড়ে ফেলা হোক। তবে ধুলোই থাকবে না আর ধুলো নিয়ে মাথাব্যথাও থাকবে না। কিন্তু সেখানে একটা গোলযোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ সেটা লেখেননি। তাতে একটা বড় গোল দেখা দিত। গোটা ধরাকে মুড়ে ফেলা হলে তবে তো রাজা প্রজা এক হয়ে যেত। কারও পায়েই যে ধুলো লাগত না। সেটা আবার হয় নাকি! কোনো গণতন্ত্রেও কি রাজা-প্রজা এক আইন হতে আছে! সেটা বুঝেছিলেন বৃদ্ধ চামার কুলপতি। রবি

ঠাকুর মশাই লিখেছেন—

তখন ধীরে চামার-কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
'বলিতে পারি করিলে অনুমতি,
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।'

জুতো আবিষ্কারের আরও দাবিদার আছেন। জুতো খুঁজতে গিয়ে হাতে এল শ্রীপান্থ ছদ্মনামের আড়ালে নিখিল সরকারের একটি প্রবন্ধ। 'আরও য়েল ও চপ্পল' নামের ১৩৯১ বঙ্গব্দে প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়। সেখানে তিনি শাস্ত্রকার গিরিশচন্দ্র বেদান্তদীর্থ মহাশয়কে উল্লেখ করে লিখেছেন, জুতো আবিষ্কারের পিছনে সূর্যেদেবের বড় ভূমিকা রয়েছে। এবং সেটি রয়েছে মহাভারতের অনুশাসনপর্বের একটি অধ্যায়ে। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে জুতো আবিষ্কারের কাহিনি শুনিয়েছেন। শ্রীপান্থ লিখেছেন— 'একদিন ভর-দুপুরে জমদগ্নি আকাশ তাক করে বাণ ছুঁড়েছিলেন। স্ত্রী রেণুকার কাজ ছিল, সেই বাণ কুড়িয়ে আনা। প্রচণ্ড রোদ। পায়ের তলায় তপ্ত মাটি, মাথার ওপরে অগ্নিক্ষরা আকাশ। রেণুকা ক্লান্ত, অবসন্ন। তাই দেখে জমদগ্নি ভীষণ চটে গেলেন। তিনি বরাবরই বদরাগী। রেগে গিয়ে ধনুতে বাণ লাগালেন সূর্যকে নিশানা করে। বিপন্ন সূর্য তখন নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মর্ত্যবাসীকে উপহার দিলেন ছাতা আর জুতো। একের কাজ মাথা বাঁচানো, অন্যের পদসেবা।'

হল তো! রবি ঠাকুরের সেই বৃদ্ধ চামার কুলপতির কৃতিত্ব জাহির শেষ। জুতো আবিষ্কারের পেটেন্ট তার হাতে অতএব থাকছে না। যতই সুয্যিমামা ডেকে আত্মীয়তা করতে যাই সেও তো রাজা নাকি? চামাররা কখনো পেটেন্ট পায়! কলিযুগের জুতো আবিষ্কারের দাবি নিয়ে তাই তক্ক করা অবান্তর। কে কবে আবিষ্কার করল জেনেই হবে কী, পরার কথা পরুন। তবে ইতিহাস বলছে, আধুনিক কালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৮৪৫ সালে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জুতো তৈরির কারখানা স্থাপন করে। এই সময়েই প্রথম যন্ত্র দ্বারা জুতো তৈরি শুরু। এই যন্ত্রের আবিষ্কার করেন এলিস হাও নামে এক ব্যক্তি। অবশ্য ১৮৫৮ সালে লেম্যান আর ব্লেক নামে বিলেতের এক সাহেব জুতো বানানোর আধুনিক যন্ত্র তৈরি করেন। যদিও গর্ডন ম্যাককে নামক এক ব্যক্তি লেম্যানের যন্ত্রের পেটেন্ট কিনে নেন। এই গর্ডনের প্রতিষ্ঠিত জুতো কোম্পানিই যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীকে জুতো সরবরাহ করে। যুদ্ধ থেমে গেলে শুরু হয় জনসাধারণের জন্য জুতো তৈরি। এখন যে এত লেডিজ, জেন্টস জুতো তা কিন্তু ছিল না। জুতোর লিঙ্গ বৈষম্য শুরু হয়েছে উনবিংশ শতকে। মেয়েদের জুতো আসতেই তাতে কারুকার্য শুরু হল। কোনোটায় নীল ফিতে, কোনোটায় লাল। তবে এসব যন্ত্র-জুতোর আগে ঘাস থেকে কাঠ, গাছের ছাল থেকে লোহা অনেক জুতোই মানুষের পায়ের তলায় থেকেছে। মাথাতেও উঠেছে। লাই দিলে তো মাথায় উঠবেই। দেখবেন, পা রক্ষার জন্য যে জুতো তা মানুষ ভুলে যায় রাস্তায় জল জমতে দেখলেই। জলের আড়ালে থাকা নানা বিপদ ভুলে নগ্ন পা নোংরা জল, পাঁক, কাদায় ডুবিয়ে জুতো তুলে নেয় হাতে। এমন হাস্যকর কাজ মানুষ ছাড়া কে করতে পারে বলুন তো?

ওসব তর্ক কথা থাক। তবে জুতো তৈরির উপকরণ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে একটা জোকস্ মনে পড়ে গেল। মনের এই দোষ। অবান্তর প্রসঙ্গ এসে যায়। জুতোর সঙ্গে যদিও এর কোনো সম্পর্ক নেই, তবুও মনে যখন এসেই গেছে বলে ফেলি। না হলে ভালো কথায় মন বসবে না।

গরুর রচনা লেখার আগে শিক্ষক অনেকগুলো সূত্র ছাত্রদের বুঝিয়ে বললেন। সবাই তা ঠিক মতো বুঝেছে কিনা তা আবার পরখ করে নিচ্ছেন—

শিক্ষক : আচ্ছা, বল তো দেখি পায়ের জুতো কী দিয়ে তৈরি হয়?

ছাত্র : চামড়া দিয়ে স্যার।

শিক্ষক : চামড়া কোথায় পাওয়া যায়?

ছাত্র : গরুর গা থেকে।

শিক্ষক : আচ্ছা, এখন বলো দেখি, কোন সে জীব, যে তোমাদের পায়ের জুতো জোগায়, আবার নানা খাবার জিনিসও জোগান দেয়?

ছাত্র : আমার বাবা, স্যার।

না, বাবাকে অসম্মান করতে চায়নি ওই ছেলে। সম্মানই দেখিয়েছে। তবে বাবার সামনে বললে, নিশ্চিত জুতোপেটা খেতে হতো। জুতোর ইতিহাসে বাঙালি বাবাদের কথা অবশ্যই লেখা দরকার। এখানে বাবা মানে জনক, পিতা। কোনো বাবাজি নন। এই বাবারা সবাই পেরে না উঠলেও ছেলেপিলেদের একবার না একবার 'জুতোপেটা'র হুমকি দিয়ে থাকেন। না, সে বাবারা ইতিহাস হয়ে গিয়েছেন। আধুনিক বাবারা এসব বলেন না। এই প্রসঙ্গে এক মেয়ের বাবার কথা মনে পড়ে গেল। সেই মেয়ে ছিল খুব লম্বা। মেয়ের বাবা ছিলেন আমার শিক্ষক। আমাদেরই এক লম্বা সহপাঠী সেই লম্বা মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল। একদিন ধরাও পড়ে শিক্ষক মশাইয়ের কাছে। লম্বা ছেলেদের মনে হয়, সাহসও বেশি হয়। তীব্র বকুনির মধ্যে দাঁড়িয়েও সেই ছেলে বলেছিল, আপনার সুবিধার জন্যই আমি প্রেম করেছি। অত লম্বা মেয়ের জন্য জামাই খুঁজতে আপনার কষ্ট হবে।'

এটা আমার বলার উদ্দেশ্য নয়। আসলটা ছিল এর উত্তরে আমাদের সেই গুরুগম্ভীর শিক্ষকের জবাব— তিনি বলেছিলেন, ‘তোমাকে সেসব নিয়ে ভাবতে হবে না। নিজের চরকায় তেল দাও। প্রয়োজন হলে বেঁটে জামাইকে আমি জুতিয়ে লম্বা করে নেব।’ মাস্টারমশাই বলেছেন বলে কথা, কোনোরকম পাঁচ ফুট আমার মনে এখনও সেই প্রশ্নটা রয়ে গিয়েছে— জুতিয়ে কি সত্যিই লম্বা করা যায়!

এবার বলুন, মানুষের জন্য জুতো না জুতোর জন্য মানুষ! এমন গবেষণাও হয়েছে। আর তাতে দেখা গিয়েছে মানব শরীরের বিবর্তনেও জুতো একটি প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। সাম্প্রতিককালের একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা বলছে, মোটামুটি ভাবে ৪০ হাজার বছর আগে মানুষ ‘পাদুকা’ পরতে শুরু করে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া প্রাচীনতম জুতোটির বয়স প্রায় ১০ হাজার বছর অর্থাৎ কৃষি আবিষ্কারের সময়। কিন্তু অ্যানথ্রোপলজিস্ট এরিক ট্রিঙ্কোসের বক্তব্য, তার কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই জুতো পরার প্রচলন শুরু হয়।

২০০৫ সালে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন এরিক এবং সেখান তিনি বলেন, ৪০ হাজার বছর আগে মানুষের পায়ের এবং শরীরের হাড়ের গঠনে যে যে পরিবর্তনগুলি ঘটতে শুরু করে তার পিছনে ছিল জুতোর অবদান। এই বিবর্তনগুলো নিয়ান্ডারথাল এবং হোমো সাপিয়েন্স, দুই প্রজাতির মধ্যেই ঘটেছিল বলে তাঁর বক্তব্য। এরিক তাঁর গবেষণায় জানিয়েছেন, এই সময় থেকেই মানুষের পায়ের পাতা উল্লেখযোগ্য ভাবে ছোট হতে শুরু করে। অথচ পায়ের হাড় যথেষ্ট বড়ই থাকে। এর থেকেই এরিক সিদ্ধান্তে আসেন— এই বিবর্তনের পিছনে রয়েছে জুতোর ব্যবহার।

এরিকের এই তত্ত্বের অবশ্য বিরোধিতা করেছেন বেশ কয়েকজন নৃতত্ত্ববিদ। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, পায়ের পাতার গড়নের পরিবর্তন সম্ভবত শ্রম বিভাজনের ফলে ঘটে। সেক্ষেত্রে যদি এরিকের গবেষণা ভুল হয়েও থাকে, তাহলে জুতো আবিষ্কারের সময়কাল দাঁড়ায় ১০ হাজার বছর। তবে আদিম

মানবের জুতোর সঙ্গে অবশ্যই আধুনিক জুতোর কোনো মিল নেই। উনবিংশ শতাব্দীর আগে অবধি জুতো তৈরির মেশিনই আবিষ্কৃত হয়নি। অর্থাৎ সভ্যতার উন্মেষ যবে থেকে হতে শুরু করেছে, সেই মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের এক শতক কেটে যাওয়ার পরেও হাতে তৈরি জুতোই শুধুমাত্র পাওয়া যেত বাজারে। প্রথম জুতো তৈরির স্টিচিং মেশিন উদ্ভাবন হয় ১৮৪৬ সালে শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে। ওই সময়েই চামড়া কাটাই করার মেশিনও তৈরি হয়। ওই সময় থেকেই ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় একাধিক শ্যু ব্র্যান্ডও বাজারে আসে।

হাঁটা মানেই বাটা। কানাডার টোরেন্টো শহরে রয়েছে বাটা শ্যু মিউজিয়াম। সেখানে জুতোর ইতিহাস সাজানো রয়েছে। দেখা হয়নি তবে পড়ার সুযোগ হয়েছে। আজ থেকে ৫৩০০ বছর আগে ইতালি অস্ট্রিয়ার সীমান্তে আল্পস পর্বতে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০ হাজার ফুট উঁচুতে সমাধিস্থ হন ওজিম্যান। তার ব্যবহৃত জুতোই হল পৃথিবীর প্রাচীনতম চামড়ার জুতো। ১৯৯১ সালে খোঁজ মেলা সেই জুতো ঘাস এবং হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরি। সেখানে রয়েছে চামড়ার উপরে সোনার বোতাম বসানো আফ্রিকার ঘানার জুতো।

জুতোর মান-সম্মান নিয়ে অনেক কথাই আলোচনা হয়েছে। তবুও বাকি রয়েছে অনেক। সদ্য একটি জায়গায় পড়লাম, জুতোয় আবার ধর্মভেদও রয়েছে। সব ধর্মে জুতোর অধিকার সমান নয়। সনাতন হিন্দু ধর্ম তো বটেই, ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্মেও জুতো পরে ধর্মাচরণের নিয়ম নেই। তবে ইহুদি ধর্মগুরুরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জুতা পরেই তাদের বাণী বিলিয়ে থাকেন। কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করেন সৃষ্টিকর্তার দেওয়া সমস্ত পরিধেয়র জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু কেউ মারা গেলে তার অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সময় জুতো পরা নিষিদ্ধ। কারণ, জুতো আবার ধনসম্পদের প্রতীক। মৃতের অনুপস্থিতিতে সবাই গরিব হয়ে গেছে—এই বিশ্বাস থেকেই ইহুদিরা তখন জুতো ব্যবহার করেন না। আমরা তো আবার মনে করি পরলোকে গিয়েও জুতো ব্যবহার করতে হয়। তাই শ্রাদ্ধকর্মের সময়ে জুতো উৎসর্গ করা বিধি। তবে সেটা পুরোহিত মশাইয়ের পায়ের মাপে।

আফ্রিকার আসান্তে উপজাতির শাসকদের পা মাটি স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। তাদের সোনার অলঙ্কার খচিত জুতো ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। রাজার জুতো যদি ভেঙে গিয়ে পা মাটি ছুঁয়ে ফেলে তো সর্বনাশ। সুতরাং রাজার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত এক জোড়া স্যান্ডেল জুতো বয়ে নিয়ে যেত একজন জুতাবাহক। শুধু রাজা নয়, অভিনেতারাও জুতোর পাহাড় বয়ে নিয়ে ঘোরেন। সব ড্রেসের সঙ্গে সব জুতো চলে না। সেই বিভাজনের আলোচনা এখানে করা যাবে না। সেই জ্ঞানও নেই আমার। শুধু জ্ঞানই নয়, সামর্থ্যও লাগে জুতোগুচ্ছ বহনের। সে অবান্তর ও অসম্ভব চেষ্টা করে জুতোর মালা পরিধানের কোনো দুরাশা নেই।

আমি বরং মনে করি জুতো বহনের চেয়ে সঠিক সময়ে সঠিক জুতোয় পা গলিয়ে ফেলাটাই দরকারি কাজ। রাজনীতি থেকে পলায়ননীতি সবেতেই সঠিক সময়ে সঠিক জুতোয় পা গলানোটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। শোনা যায়, ঠিক সময়ে জুতো জোড়া খুঁজে না পাওয়ার জন্য কিংবা পরিয়ে দেওয়ার নোকর না পাওয়ার জন্যই কি সিরাজউদ্দৌল্লা পালাতে পারেননি। তিনি জানতেন না কিন্তু পাঠিকারা নিশ্চয়ই জানেন যে, পালানোর সময়ে পায়ের জুতো হাতে তুলে নিলে বেশি সুবিধা হয়। তবে আর জুতো ছেড়ে পালাতে হয় না। আম, জাম পাড়তেও জুতো ব্যবহার করা যায়। জুতো পেতে বসা তো সকলেই দেখেছেন, কলকাতার ময়দানে অলস দুপুরে জুতো মাথায় দিয়ে ঘুমোতেও দেখা যায়। এই ছেলেখেলা লেখায় খেলার জুতোর কথা বাদই থাকুক। কিন্তু জুতোর খেলা বাদ দিলে চলবে না। 'দিদি তেরা দেবর দিওয়ানা' গানটা মনে আছে তো?

জুতো-মাহাত্ম্য আর বুঝিয়ে বলতে হবে না নিশ্চয়ই। তাই জুতোকে শুধু জুতোর জায়গায় রাখলে চলবে না। তর্কশাস্ত্রে তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈলি সে উত্তর মেলেনি। ডিম আগে না মুরগি আগে—এই তর্কও মেটেনি। কিন্তু ব্যাকরণবিদরা বলে দিয়েছেন গরু মেরে জুতা দান আর জুতা মেরে গরু দান—এর দুটোই সত্য। কেননা, গরু মেরে পরে তাকে জুতা দান যেমন সম্ভব, তেমনি জুতা মেরে পরে তাকে গরু দান করা সম্ভব। সবটাই নির্ভর করছে যিনি গ্রহণ করছেন তাঁর উপর।

এক্ষেত্রে একটা সবার জানা গল্প বলতেই হচ্ছে। দীনবন্ধু মিত্র নীলকরের অত্যাচার নিয়ে লিখলেন 'নীলদর্পণ' নাটক। প্রথমদিকের এক প্রদর্শনীতে দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নীল চাষীদের উপরে নীলকর উডের অত্যাচারের অভিনয় দেখে তিনি এতটাই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন যে, পায়ের জুতো খুলে ছুঁড়ে মেরেছিলেন অভিনেতাকে লক্ষ্য করে। শক্তিমান সেই অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি নাকি সম্মান হিসাবে সেই জুতোকে তুলে নিয়েছিলেন যত্ন করে। এ তো সত্যিই জুতো মেরে গরু দান।

ইদানীং রাজনীতিকদের জুতো ছোঁড়ার একটা রেওয়াজ শুরু হয়েছে। সেটা 'কী'

মেরে 'কী' দান তা নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো। কারণ, আমরা এখন জুতোর পক্ষে। আর গরু মারা এই দেশে অন্যায়, অবৈধ, অনৈতিক। আবার একটা জোকস্ মনে পড়ে গেল। মাঝে একবার ভারত দেশটা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে মনে হওয়ায় খান অভিনেতা আমির বলেছিলেন, এ দেশ ছেড়ে চলে যাব। তখন নানা রঙ্গ তামাশাও হয়েছিল। একজন আমির গিন্নি কিরণ রাওকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন— প্রিয় কিরণ, কোনো স্ত্রী যদি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন তবে তাঁর দেশ নয়, স্বামী বদল করা উচিত।

এসব সোশ্যাল মিডিয়া কারবারিদের হাস্যরস। তাঁদেরই একজন লিখেছিলেন, — আমির, তোমায় কোথাও যেতে হবে না। বাংলায় চলে এসো। তোমাকে চাকরি দেবে। ২ টাকা কেজি দরে চাল দেবে। ছেলেদের এখানকার স্কুলে ভর্তি করে দাও, তাহলে নীল-সাদা সাইকেল দেবে। আবার জুতোও দেবে।' এটা কাকে 'কী' মেরে 'কী' দান তা নিয়ে আমার মনে যথেষ্ট প্রশ্ন ছিল, কিন্তু ভয়ে আজও মুখ খুলিনি। খুললামও না।

তবে একটা কথা মনে রাখবেন। জুতো শুধু নিলেই হয় না। জুতো শুধু পরলেই হয় না। জুতোর মালিককে দায়িত্ববান হতে হয়। জুতোর দায় নিতে হয়। দেখবেন, বিশেষ করে ধর্মস্থানে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা থাকে— নিজ জুতা নিজ দায়িত্বে রাখুন।

অবশ্য জুতো যে পরিমাণ দায়িত্ব পালন করে সেও এইটুকু আশা করতেই পারে। কিন্তু আমার মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন কিছু মানুষ সব সময়েই সংসারে থেকে যায়। যারা জুতোর দায়িত্বও নিতে জানে না।

এ বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের রসসম্রাট শিবরাম চক্রবর্তীও। শোনা গল্প। একবার তাঁর মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের ঘরে কয়েকজন বন্ধু এসেছিলেন। তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই জুতো খুলে ঘরে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু শিবরামকে তো টিপ্পনি কাটতেই হবে। তিনি নাকি বলেছিলেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি। আমার ঘরের নোংরায় তোমাদের জুতো নোংরা হয়ে যাবে ভেবেই ওগুলি বাইরে খুলে

রেখে এসেছ। জুতোর প্রতি দায়িত্ব পালন।'

ভারতের ইতিহাস আবার অনেক অনেক প্রাচীন। তাই অনেক ক্ষেত্রে তর্কে না যাওয়াই ভালো। এদেশে ব্যবহৃত খড়ম কত আগের কে জানে! কোন সত্য যুগে রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে রেখে রাজ্য শাসন করেছিলেন ভরত। বহু বাড়িতে নিত্য গুরুদেবের পাদুকা অভিষেক করা হয়। শ্রীচৈতন্যের পায়ের ছাপ কত জনপদে সংরক্ষিত। যেখানে যেখানে তিনি পদার্পণ করেছেন, সেখানে সেখানে ভক্তি ভরে তাঁর পদচিহ্ন পূজিত হয়। সুতারং ভক্তের কাছে পাদুকা বা জুতো আসলে ভক্তির প্রতীক, প্রণম্য। আবার সমাজতাত্ত্বিকের কাছে জুতো প্রগতির প্রতীক। ঘোড়ার পায়ে লোহার জুতো পরানোর পরেই যুদ্ধক্ষেত্রে যুগান্তর এসেছে। আধুনিক জুতো এভারেস্ট জয় করতে শিখিয়েছে। জুতো আবার গতিরও প্রতীক। তাই তো গ্রিক দেবতার জুতোর ডানাও থাকে। জুতো আবার নারীত্বের প্রতীক। সে উদাহরণ পশ্চিমী উপকাহিনির ছত্রে ছত্রে। একটা উদাহরণ যথেষ্ট— সিন্ডারেলা। এদেশের কাহিনিতে যেমন আংটি বা অঙ্গুরীয় পশ্চিমে তেমনই জুতো। এমন অনেক কাহিনিতেই এক পাটি জুতো হারিয়েছেন নায়িকা। আর সেই জুতোটি পেয়ে মালকিনকে খুঁজতে খুঁজতে রাজা পৌঁছে গেছেন সুন্দরীর কাছে। জুতো আবার উর্বরতারও প্রতীক। একটা ইংরেজি রূপকথায় পড়েছি এক বুড়ির কথা। যাঁর একটা মস্ত বড় জুতো ছিল। সেই জুতোর মধ্যে ভরা থাকত তাঁর ছেলেপুলে।

জুতোয় কুসংস্কারেরও কি অভাব আছে নাকি? ইউরোপে নাকি প্রেয়সীকে মনের কথা জানাতে জুতোয় ঢেলে মদ্যপানের রীতি ছিল। উত্তর ভারতের এক গ্রাম্য মন্দিরে পুত্র কামনায় স্বামীর জুতো ধুয়ে জল খাওয়া হয়। জুতো শুকিয়ে মৃগি রোগীর জ্ঞান ফেরানোও যাঁরা বিশ্বাস করেন না, তাঁরাও মনে করেন জুতো সম্পত্তির উপরে কুনজর থেকে বাঁচায়। গাড়ির পিছনে জুতো আঁকার চলন গোটা দেশেই। আর এই বাংলায় সাধারণ গৃহস্থ থেকে নামী ডেভেলপার নতুন বাড়ি বানানোর সময়ে পুরনো ঝাঁটা, ঝুড়ির সঙ্গে একপাটি ছেঁড়া জুতো ঝুলিয়ে রাখেন। জুতোর জোরে প্রগতিও আমরা কম দেখিনি। আজ যে ললনা চপ্পল পরে ঘরের ভিতরে থাকেন কিংবা রান্না করেন তাঁকে দেখার আগে তাঁর সেই পূর্বজকে স্মরণ করুন— যিনি পুরুষতন্ত্রের নিষেধ ভেঙে প্রথমবার জুতোয় পা গলিয়েছিলেন। জুতো মানে যে বহির্গমনও। জুতোর জোরেই তো একদিন মেয়েরা ঘর ছেড়ে বার হয়েছিল। সেই প্রবাদটাকে মিথ্যা করে দিয়েছিল— 'মেয়েরা দেয় জুতা পায়, ভাতব্যঞ্জন পুড়ে যায়।' প্রথম যিনি চপ্পল পরে রান্নাঘরে প্রবেশ করেছিলেন তাঁকেও স্মরণ করতে হবে। বাইরে বের হওয়ার চেয়ে পাকশালার শুচিতাকে চ্যালেঞ্জ করাটাও কোনো অংশে কম বৈপ্লবিক ছিল না।

আবার একটু শ্রীপান্থর লেখা হুবহু বলা যাক— তিনি লিখেছেন, 'সূর্যদেব রেণুকাকে জুতো উপহার দিয়েছিলেন, না স্যাণ্ডেল? জানি না। তবে শাস্ত্রজ্ঞরা বলছেন, সব ধরনের জুতোই ছিল এদেশে। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ লিখেছেন, তৈত্তিরীয় সংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ, গোভিলগৃহ্যসূত্র — অনেক শাস্ত্রগ্রন্থেই জুতো রয়েছে। নানা ধরনের জুতো। কখন কোন উপলক্ষে কী ধরনের জুতো পরতে হয় তাও নাকি বিধান দিয়ে গেছেন প্রাচীন শাস্ত্রকাররা। কোন তিথিতে লাউ খাওয়া যেতে পারে, কোন তিথিতে বেগুন, তাও যখন বলে গেছেন তাঁরা, তখন জুতোর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির কথা ভুলে যাবেন, তা কেমন করে হয়? কাষ্ঠ, চর্ম, তৃণ— সব ধরনের প্রাচীন পাদুকা চর্চা করে বেদান্ততীর্থমশাই জানাচ্ছেন, প্রাচীন ভারতে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা ছিল নাকি আজানুপত্রচরণের। অর্থাৎ বুটজুতোর। এখানে ওখানে যেসব সূর্যমূর্তি পাওয়া গেছে তার পায়ে নাকি রয়েছে সেই আজানুপত্রচরণের নমুনা। অবশ্য পাথরের গায়ে ওইসব রেখা কি জুতোর রূপরেখা না অন্য কোনো গহনা, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর তর্কাতর্কিও হয়ে গেছে একসময়। আর এক বিতর্কের প্রতিপাদ্য ছিল তৃণ বা ঘাসে তৈরি জুতো। প্রাচীনকালে যার নাম ছিল 'মঞ্জ' তাই কি একালের মোজা?'

মোজা নয়, আমরা জুতোতেই সোজা থাকব। কারণ জুতো নিয়ে কম বিপ্লব দেখেনি এই দেশ। সব দেশে, সব কালে জুতো সাম্রাজ্যে উচ্চ শ্রেণীর মর্যাদা পেয়েছে বুট আর একেবারে অন্ত্যজ শ্রেণীতে পড়েছে চপ্পল। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এই ভারতে সমানে সমানে বুট বনাম চপ্পল লড়াই হয়েছে। বুটের মুখে সামনে চপ্পলে জবাব দিয়েছিলেন খোদ বিদ্যাসাগর মশাই। বুটকে প্রভু মনে করতে চায়নি একদল চপ্পল। প্রভুর অলিখিত নির্দেশে ধনী ভারতীয়কেও ব্রিটিশ সাহেবের সামনে খালিপদ হয়ে যেতে হতো। এ ভারতের মানুষের সংস্কৃতিতেই রয়েছে যে, ঈশ্বর কিংবা জ্ঞানী, গুণী, মানীজনের সামনে জুতো পায়ে যাওয়াটা অশিষ্ট আচরণ। রাজপুরুষের সামনে জুতো তো নয়ই এমনকি ছাতা মাথায় দেওয়াও ছিল অসৌজন্য। তাই শাসককে প্রভুর পদে বসিয়ে রেখেছিলেন যাঁরা, তাঁদের তেমন সমস্যায় পড়তে হয়নি। স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল। আজও তাঁরা সাহেব ক্লাবে গেলে সাহেবি কায়দায় বুট জুতোয়

মশমশিয়ে যান। চপ্পলের চটুল শব্দ যেন সহস্র যোজন দূরের সাহেব বংশধরদের কানে না যায়। পোশাকের কথা এখানে থাক।

উনবিংশ শতকে নেটিভদের জুতো পরার অধিকার যে ব্রিটিশ দিয়েছিল, তার পিছনে কয়েকজনের লড়াইকে অস্বীকার করা যাবে না। কোনো চপ্পল-বিদ্রোহের কথা ইতিহাসে না লেখা থাকলেও মনে রাখতে হবে সেটা কিন্তু চলেছিল। ১৮৭৪ সালে চটি না খোলার কথা জানিয়ে দিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির দরজা থেকে ফিরে এসেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উড্রো সাহেবের সামনে নির্দেশ সত্ত্বেও বুট জুতো খোলেননি শিবনাথ শাস্ত্রী। তখন কলকাতায় সাধারণের জুতো পরার অধিকার থাকলেও বাকি বঙ্গে ছিল না। এরপর ১৮৬৮ সালে কলকাতার বাইরের মানুষকেও জুতো পরার অধিকার দেয় মহানুভব ব্রিটিশ সরকার। তখনও কিন্তু চপ্পলের স্বাধীনতা মেলেনি। ১৮৯৮ সালে লাটভবনে লর্ড কার্জনকে অভিবাদন জানাতে গিয়েও ফিরে আসতে হয় সেই সময়ের ডাকসাইটে ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে। কারণ, পায়ে ছিল বাঙালি চটি। এমনই কোনো একটা সময়ে একটি বাংলা কাগজ ব্যঙ্গ করে লিখেছিল— ‘রে তালতলার চটি, ইংরাজের আমলে কেবল তোরই অদৃষ্ট ফিরল না।’

আসলে ‘বুট’-সাহেবেরা কোনোদিন জানতেই পারেনি চটির কী মজা! সে নিরাসক্ত। পায়ে পায়ে থাকলেও জাপ্টে, চেপ্টে থাকে না। পরায় বা খোলায় মাথা নত করতে হয় না। কোমর নোয়াতে হয় না। জলে ডোবা রাস্তায় অক্লেশে সে হাতে উঠে আসে। লাগে না মোজার অন্তর্বাস। এমন খোলামেলা আচরণ দুনিয়ায় আর কীসে আছে বলুন তো!

চটি দিয়ে মুখও চেনা যায়। আমি তো পারি। মেয়েকে নিয়ে পড়াতে যাই এক প্রতিষ্ঠানে। সেখানে অনেক অনেক চটি, জুতো খোলা থাকে। আমি জুতো খুলে ভিতরে যাই না। বরং ছড়ানো জুতোর অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে জুতো দেখি। চেনার চেষ্টা করি কোনটি আড়ালে থাকা সবচেয়ে রূপসী তরুণীর। বোঝার চেষ্টা করি কত জন আধুনিকা রয়েছেন অন্দরে কিংবা সারাদিন হেঁসেল ঠেলা মা। নানা নকশায়, নানা মাপের জুতো বলে দেয় কার পকেটের রেস্ত কেমন, কার ফুটানি কেমন। আসলে জুতো যে কথাও বলে। সে অনেক কিছুই বলে দেয়।

বিশ্বাস হচ্ছে না! চোখটি বুজে মনের কানটি খুলে রাখুন। শুনুন, শুনতে পাচ্ছেন! খড়ম পরে অষ্টমী দিদিমা গঙ্গা নেয়ে ফিরলেন। বুট মশমশিয়ে বড় রাস্তায় আপিসের গাড়ি ধরতে গেলেন গুপ্ত সাহেব। ওই বুঝি হাওয়াই চপ্পলের চটাং চটাং শব্দে ঠিকে কাজে বেরিয়ে গেল রতনের মা। মল্লিকবাড়ির মেজ তরফের ছোট্ট নাতিটা কাজের মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে। লাল জুতোয় বাঁশি লাগানো। নিজের ছেলেবেলার কথা ভাবুন। বাবা- মা-র পায়ের শব্দ আলাদা আলাদা করে শুনতে পাচ্ছেন তো! মনে রাখবেন, জুতো আসলে ফেরিওয়ালা। হরেক ফেরির হরেক শব্দ। জুতোর তালে তালে নুপুরের শব্দ মিশে কানে আসছে! তবে নিশ্চয়ই সে এদিক পানেই আসছে।

এখন কী শুনছেন! ভারি বুটের শব্দ! ওটা যুদ্ধ লাগা শব্দ। খেয়াল করুন, একটু পরেই বারুদের গন্ধ পাবেন। তারপর আরও চিৎকার, আর্তনাদ শুনতে পাবেন। অনেক জুতো একসঙ্গে প্রাণ হাতে পালাচ্ছে শুনতে পাবেন। তার পরে ভারী বুটের সঙ্গে হালকা চটির অসম লড়াই শুনতে পাবেন। একটু অপেক্ষা করুন। এখন রাস্তায় বের হওয়ার দরকার নেই। নিজেকে বুঝতে পারবেন সব কোলাহল থেমে গেলে। এক পা, দু-পা করে এগিয়ে যান। দেখবেন অনেক জুতোর শরীর পড়ে রয়েছে। বেশিরভাগই এক পাটি। কোনোটা থেঁতলে গেছে, কারও গায়ে রক্তের ছিঁটে, কেউ উপুড় হয়, কেউ চিৎ হয়ে, কেউ ছিন্নভিন্ন। ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে। চোখটা ফের বুজে ফেলুন। দেখবেন কুরুক্ষেত্র আর কলকাতার রাজপথ এক হয়ে গিয়েছে।

ছিঃ ছিঃ। জুতো নিয়ে রম্য আলোচনা করার কথা দিয়ে শেষে কিনা যুদ্ধক্ষেত্র। আরে বাবা এই নিয়েই তো জীবন। বুট আর চপ্পলের ভেদাভেদ তো থাকবেই। শ্রেণীহীন সমাজ তো আসলে কাঁঠালের আমসত্ত্ব। সেটা মানুষের মতো জুতোর সমাজেও। বরং একটা গল্প শুনিয়ে শেষ করা যাক। এ গপ্প পড়েছি তারাপদ রায়ের লেখায়। সত্যি মজার গল্প।

জামাই এসেছে শ্বশুর বাড়ি। শ্বশুরের পায়ে নতুন জুতো। বারবার সেই দিকে তাকাচ্ছে।

শাশুড়ি— ‘জুতোটা মনে হয় বাবাজীবনের বেশ পছন্দ হয়েছে।’

শ্বশুর— ‘তাহলে তুমি এটা নিয়ে নাও বাবা।’

জামাই— ‘কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করলে কী বলবেন?’

শ্বশুর— ‘সে বলে দেব, রাস্তার একটা কুকুর নিয়ে চলে গিয়েছে।’

দাঁড়ান, দাঁড়ান জুতো খোলার আগে শেষ কথাটা শুনে নিন। সেই যে লেখার গোড়ায় বলেছিলাম না জুতো চুরি রুখতে আধুনিকতম আবিষ্কারটা জানিয়ে দেব। শুনে নিন আমার এক অতি কাছের বন্ধুর দেওয়া পরামর্শ— মনে করে দু পাটি জুতো দু জায়গায় রাখুন। চোরের অত পাটি মিলিয়ে খোঁজার সময় থাকে না। তবে নিজে যেন ভুলে যাবেন না। একান্তই ভুলে গেলে পছন্দ মতো একটিতে পা গলিয়ে দিন। গল্প শেষ। ■

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই—

M/s. Sharda Textiles

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

With Best Compliments from :

C. S. SALES (INDIA)
PVT. LTD.

18, Amratala Street, 1st Floor
Kolkata - 700 001

বিশ্বের প্রথম ধারাভাষ্যকার

বিজয় আঢ্য

মৎস্যরাজ বিরাটের রাজধানী উপপ্লব্য। অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহ উপলক্ষে সেই উপপ্লব্য নগরে অনেকেই আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। বিরাটরাজ তো রয়েইছেন। আমন্ত্রিত পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, বসুদেব, বলরাম, কৃষ্ণ, সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব প্রমুখও আছেন। কৃষ্ণের পরামর্শে এই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চাইছিলেন পাণ্ডবরা। অজ্ঞাতবাস পর্ব শেষ হয়েছে। এবার রাজ্যোদ্ধারের পালা। তাই নিয়েই মন্ত্রণা। দুর্যোধনের অভিপ্রায় কী তা প্রথমে জানা দরকার। স্থির হলো, বয়সে ও জ্ঞানে বৃদ্ধ দ্রুপদ-রাজ তাঁর পুরোহিতকে দূত হিসাবে হস্তিনাপুরে পাঠাবেন।

সেইমতো দ্রুপদের পুরোহিত হস্তিনাপুরে পৌঁছেও গেলেন। কৌরব রাজসভায় ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর প্রমুখ তাঁকে যথোচিত সংবর্ধনাও জানালেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর পুরোহিত বললেন, ধর্মপথে থেকে পাণ্ডবরা সন্ধি কামনা করেছেন— এই বার্তা আপনাদের কাছে পৌঁছাতেই তিনি এখানে এসেছেন। প্রস্তাবের বিরোধিতা না করলেও পুরোহিতের বাচনভঙ্গীকে কটাক্ষ করলেন পিতামহ ভীষ্ম। আর কর্ণ তো প্রস্তাবটিকে আমলই দিলেন না। ধৃতরাষ্ট্র অবশ্য এই আস্ফালনের জন্য কর্ণকে ভর্ৎসনাই করলেন। পরে দ্রুপদ-পুরোহিতকে বললেন, মহাশয়, আপনি আজই উপপ্লব্যে ফিরে যান। আমি চিন্তা করে পাণ্ডবদের কাছে সঞ্জয়কে পাঠাব— 'চিন্তয়িতা তু পার্থেভ্যঃ প্রেষায়য্যামি সঞ্জয়ম্' (মহাভারত,

উদ্‌যোগপর্ব)।

মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের সহোদর না হলেও ভাই— দু'জনেরই জন্ম মহর্ষি ব্যাসদেবের ঔরসে। সে তার বিশ্বাসের পাত্র এবং যোগ্যও। তবু কেন জানি, বিদুরকে ধৃতরাষ্ট্রের মনে ধরল না। এমনকী পিতামহ ভীষ্মের মুখের কথাতেই কাজটা সুসম্পন্ন হতো। তবু ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কেই দূত হিসাবে পাঠাতে মনস্থ করলেন। শুধু তাই নয়, উপপ্লব্যনগরে উপস্থিত হয়ে পাণ্ডবদের কী বলবেন এবং কী ভাবে বলবেন তারও তালিম দিলেন। বললেন— প্রথমে পাণ্ডবদের কুশলাদি সংবাদ নেবে এবং অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন করে জানাবে যে আমি শান্তিই চাই। সকলের মঙ্গল ও ভরত বংশের হিতকর এবং যাতে যুদ্ধের প্ররোচনা না হয় এমন কথাই তুমি বলবে।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের অমাত্য এবং বয়স্যও বটে। তিনি সূতপুত্র। গবল্‌গণ তাঁর পিতা। তাঁর পৈতৃক ও স্বকীয় বৃত্তি হলো সূতের। সেই যুগে বিপ্রকন্যা ও ক্ষত্রিয় পুরুষের সন্তানদের সূত বলা হতো। সূত শুধু রথচালক নয়, পুরাণকথকও। তিনিই সূত, যিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যান— রথের সারথি হিসেবে কিংবা সংবাদ বাহক রূপে। দৌত্যকর্ম করেন শুধু দুই রাজার মধ্যে নয়, পুরাণকথক বা বার্তাবাহকের ভূমিকায় একের সঙ্গে বহুজনের সংযোগসাধনও করেন সূত। তাই ভারতবর্ষের প্রাচীন থেকে আধুনিক সকল বিষয় অধিগত রাখতে হয়েছে সূতপুত্র সঞ্জয়কে। ব্যাসদেবের পরেই মহাভারত কথক হিসেবে তাঁর নামই প্রথমে উল্লেখ করতে হয়। আবার যেহেতু তিনি অমাত্য, রাজাকে মন্ত্রণাদান ও রাজজ্ঞা পালনই তাঁর স্বকর্ম। স্বধর্মে থেকে সেই স্বকর্মই নিষ্ঠা সহকারে পালন করে চলেছেন সঞ্জয়।

সঞ্জয়ের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের এমন আস্থা এই প্রথম নয়। এর আগেও ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের উপর নির্ভর করেছেন। যেমন ঘটেছিল পুনর্বার দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে পাণ্ডবদের বনযাত্রার সময়। দ্বাদশবর্ষ বনবাস আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস। ঘটনা যখন ঘটে গেল এবং যার জন্য তিনিই মূলত দায়ী, কেননা তাঁর সম্মতি নিয়েই পুনর্বার দ্যূতক্রীড়া হয়েছিল, সেই ধৃতরাষ্ট্র তখন বিদুরের পরামর্শ চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, যাতে কুরু পাণ্ডবের হিত হয় এমন উপায় বল। অথচ বিদুর যখন সেই উপায় হিসাবে পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বললেন, ধৃতরাষ্ট্রের তখন তা মনপুতঃ হলো না। বরং বিদুরকেই তিনি সন্দেহের চোখে দেখলেন। একটু বিতৃষ্ণা ভরেই বললেন, তোমার কথা পাণ্ডবদের হিতকর, আমাদের অহিতকর। পাণ্ডবদের জন্য নিজের পুত্রকে কী করে পরিত্যাগ করব? তুমি যা বলছ, সবই কুটিলতাময়। তুমি এখান থেকে চলে যাও বা থাকো, যা ইচ্ছা হয় কর।

অগ্রজের এমন ব্যবহারে হতাশ বিদুর কাম্যকবনে পাণ্ডবদের কাছে চলে যাওয়ার মনস্থ করলেন। গেলেনও। আর তা জেনে ধৃতরাষ্ট্রের আবার অনুতাপ হলো। বিদুর শুধু তাঁর ভাই-ই নয়, বন্ধুও বটে। মন যখন বিষণ্ণ, তখন মন চায় নির্জনতা। ধৃতরাষ্ট্র নির্জনে একাকী বসে রইলেন। অস্থির তাঁর চিত্ত। ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছেন। এমন সময় সঞ্জয় এসে বলেছেন, মহারাজ, আপনি তো এই-ই চেয়েছিলেন। এ তো আপনারই কর্মের ফল— 'তুয়ৈবেদং কৃতং রাজন্।' মহারাজ, বিনাশকাল যখন উপস্থিত হয়, তখন বুদ্ধি মলিন হয়ে যায়। ন্যায়-অন্যায় কর্তব্য-অকর্তব্যের কোনো ভেদরেখা থাকে না— 'উত্তিষ্ঠতি বিনাশায় নূনং তচ্চাস্য রোচতে।' (মহা., সভা, ৭৮।৯)। শুধু এই আপ্তবাক্যটি ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়ে দিয়েই সঞ্জয় কিন্তু থেমে থাকলেন না। উত্তম বৈদ্যের মতো রোগমুক্তির উপায়টিও নির্দেশ করেছেন। বললেন, মহারাজ, আপনি এখন নিঃশঙ্ক চিত্তে কৌরব-পাণ্ডব উভয়পক্ষেরই ন্যায়সঙ্গত শান্তিবিধান করুন। এরকম করলে আপনি পরম মঙ্গলকে লাভ করবেন— 'এবং কৃতে মহারাজ! পরং শ্রেয়স্তমাপস্যসি।' (সভা, ৭৮।৩৪)

কিন্তু ঘটনা হলো, এত কাণ্ডের পরও ধৃতরাষ্ট্র বললেন, সঞ্জয়, বিদুরও আমাকে এরকম ন্যায়সঙ্গত কথা অনেক বলেছে। তুমি বরং একবার বিদুরকে ডেকে নিয়ে এসো। তাঁর এই অমাত্যটি যে বিদুরের প্রিয়পাত্র এবং তাঁরই মতো ধর্মশীল, ধৃতরাষ্ট্র তা জানতেন। তাই যখনই কোনো সংকট উপস্থিত হয়েছে, মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, তখনই পরিত্রাণের উপায় হিসাবে বিদুরের পর সঞ্জয়ের উপরই আস্থা রেখেছেন।

ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশমতো কৌরবপক্ষের দূত হয়ে সঞ্জয় উপপ্লব্য নগরে বিরাট রাজসভায় পৌঁছালেন। পঞ্চ পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণ-সহ পাণ্ডবপক্ষের সকল রথী-মহারথী সেখানে উপস্থিত। উভয়পক্ষের কুশলাদি বিনিময়ের পর যুধিষ্ঠির সঞ্জয়ের দৌত্যকর্মের হেতু জিজ্ঞাসা করলেন। সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, কুরুবংশের মঙ্গল কামনা করে যা বলব তা শুনুন। আপনারা দুর্যোধনের কোনো অপকার করেননি। তবুও তিনি আপনাদের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত। স্থবির ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ চান না, তিনি মনস্তাপ ভোগ করছেন। শান্তির প্রশংসা করে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। হে বীর পাণ্ডবগণ, হীন কাজ করা আপনাদের সাজে না। তাই কৌরবদের যদি যুদ্ধে বিনষ্ট করেন, তাহলে জ্ঞাতিবধের ফলে আপনাদের জীবন মৃত্যুতুল্য হবে— 'সমং বস্তুজীবিতং মৃত্যু না স্যাদ্‌যজ্জীবধ্বং জ্ঞাতিবধেন সাধু।' (মহা, উদ্‌যোগ)। জয়ে বা পরাজয়ে কোনো মঙ্গলই দেখছি না। সকলের মঙ্গলের জন্য তাই সন্ধি প্রার্থনা করছি।

উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, পাণ্ডবগণ ধর্মের জন্য সুখ কামনা করে। যে লোক ইন্দ্রিয় সুখ চায় সে আরও সুখ চায়। বিশাল ভোগসুখে থেকেও ধৃতরাষ্ট্রের তৃপ্তি নেই। দুর্যোধনের স্বভাব

জেনেও তিনি বিশ্বস্ত বিদুরের উপদেশ অগ্রাহ্য করে অধর্মের পথে চলেছেন। আমরা কত কষ্ট পেয়েছি, তা আপনি জানেন। আপনার অনুরোধে সমস্তই ক্ষমা করতে প্রস্তুত, কৌরবদের সঙ্গে আগে আমাদের যে সম্পর্ক ছিল তাও বজায় থাকবে। কিন্তু দুর্যোধন আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিন। ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য আবার আমাদের হোক।

সঞ্জয় তখন বললেন, কৌরবগণ যদি আপনাকে রাজ্যের ভাগ না দেন তবে আপনাদের ভিক্ষা করাও শ্রেয়, কিন্তু যুদ্ধ করে রাজ্যলাভ উচিত হবে না। মানুষের জীবন অল্পকাল স্থায়ী, দুঃখময় ও অস্থির; যুদ্ধ করা আপনার যশের অনুরূপ নয়। তাই আপনি পাপজনক যুদ্ধ থেকে বিরত হোন। কেননা, ধর্মবিহীন পাপবুদ্ধি ব্যক্তি এই পৃথিবী লাভ করেও শান্তি লাভ করতে পারে না— 'হীনো হি ধর্ম্মেণ মহীমপীমাং লব্ধা নরঃসীদতি পাপবুদ্ধিঃ।' মহারাজ, যা বাত-পিত্ত-কফ-এর বৈষম্যে জন্মে না, যা কটু, যা শিরঃপীড়াদায়ক, যা যশোনাশক, যা সজ্জনেরা পান করে থাকেন এবং দুর্জনেরা পান করতে পারেন না আপনি বিষতুল্য সেই ক্রোধকে সংবরণ করুন। শান্ত হোন— 'সতাং পেয়ং যন্ন পিবন্ত্যসন্তো মন্যুং মহারাজ। পিব প্রশাম্য।' (মহা, উদ্)। আপনার পক্ষে ক্ষমা করাই ভাল, ভোগ ভাল নয়— 'কামায়েত ক্ষমৈব তে জ্যায়সী নোত ভোগঃ।' (মহা, উদ্)। যদি আপনার অমাত্যবর্গ আপনাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেন, তবে তাদের হাতে সর্বস্ব দিয়ে আপনি মুক্ত হোন, স্বর্গের পথ থেকে ভ্রষ্ট হবেন না।

না, নিজের বোধ থেকে নয়, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রর ইচ্ছামতোই সঞ্জয় পাণ্ডবদের কাছে তোতাপাখির মতো এইসব কথা বললেন। সঞ্জয়ের বক্তব্য শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, আমি ধর্ম করছি কী অধর্ম করছি তা জেনে আমায় নিন্দা করুন। পিতৃপিতামহের পথ ধরেই আমি চলেছি। যদি আমি সন্ধিতে অসম্মত হই, তবে আমি নিন্দনীয় হবো। আবার যুদ্ধের থেকে বিরত হই তবে ক্ষত্রিয় ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবো। তাই উভয়পক্ষের শুভার্থী বাসুদেব এই বিষয়ে কী বলেন তা শোনা যাক।

কৃষ্ণ বললেন, আমি উভয়পক্ষেরই হিতাকাঙ্ক্ষী, শান্তি প্রতিষ্ঠা আমারও কাম্য। সঞ্জয়, তুমিই বল— যুধিষ্ঠির ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে নিজের রাজ্য উদ্ধারের জন্য উৎসাহী হয়েছেন। এতে তাঁর ধর্মলোপ হবে কেন? ক্ষত্রিয় রাজাদের পক্ষে যুদ্ধ করা ধর্মসম্মত কিনা? দস্যু বধ করলে পুণ্য হয়, কৌরবগণ তো দস্যুবৃত্তিই অবলম্বন করেছেন। দুর্যোধনের সঙ্গে চোরের কী পার্থক্য আছে? সঞ্জয়, দ্যূতসভায় যা ঘটেছিল তা বিস্মৃত হয়ে এখন পাণ্ডবদের উপদেশ দিচ্ছ! পাণ্ডবগণ শান্তিকামী, যুদ্ধ করতেও সমর্থ, এই বুঝে তুমি ধৃতরাষ্ট্রকে আমাদের মত যথাযথ জানিও।

কৃষ্ণের অভিমত শুনে সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমাকে এখন ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি আবেগবশে যদি কিছু বলে থাকি তাহলে দোষ ধরবেন না। বাসুদেব, ভীমার্জুন, নকুল-সহদেব, সাত্যকি, চেকিতান, সকলকেই অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সুখে থাকুন। আমাকে প্রসন্ন নয়নে দেখুন।

সঞ্জয়কে আশ্বস্ত করে যুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, আপনি প্রিয়ভাষী দূত, কটুবাক্যেও ক্রুদ্ধ হন না। কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষই আপনাকে মধ্যস্থ মনে করেন। পূর্বে আপনি ধনঞ্জয়ের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। আপনি এখন যেতে পারেন। হস্তিনাপুরের সকলকে আমার যথাযোগ্য অভিনন্দন জানাবেন। দুর্যোধনকে বলবেন, আমরা শান্তিই চাই। রাজ্যের একটি প্রদেশ শুধু আমাদের দিক। অথবা আমাদের পাঁচ ভাইকে পাঁচটি গ্রাম দিক। তা হলেই বিবাদের অবসান হবে। সঞ্জয়, আমি সন্ধি বা যুদ্ধ উভয়ের জন্যই প্রস্তুত।

যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সঞ্জয় শীঘ্রই ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ফিরে এলেন। বললেন, মহারাজ, আপনি পুত্রের বশবর্তী হয়ে পাণ্ডবদের রাজ্য ভোগ করতে চাইছেন। এতে চারিদিকে আপনার নিন্দে হচ্ছে। আপনার দোষেই কুরু-পাণ্ডবদের বিরোধ ঘটেছে। যদি যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে না দেন তবে আপনার এমন শক্তি নেই যে এই বিশাল রাজ্য রক্ষা করতে পারেন। আমি এখন খুব ক্লান্ত, আজ্ঞা দিন এখন শয়ন করতে যাই। আগামীকাল প্রভাতে পাণ্ডব পক্ষের সব কথা আপনাকে জানাব।

পরদিন রাজসভায় ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন, কর্ণ প্রমুখ আসন গ্রহণ করলে সঞ্জয় তাঁর দৌত্যের বৃত্তান্ত সবিস্তারে নিবেদন করলেন। সঞ্জয়ের বৃত্তান্ত শুনে ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ আপন আপন অভিমত ব্যক্ত করলেন। কিন্তু কুরুবৃদ্ধদের কথা ধৃতরাষ্ট্র যেন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। তিনি শুধু সঞ্জয়কে প্রশ্ন করতে লাগলেন। বললেন, সঞ্জয় আমাদের বহু সৈন্য সমবেত হয়েছে শুনে যুধিষ্ঠির কী বললেন? কারা তাঁকে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দিচ্ছেন? আর কারাই বা তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করতে চাইছেন?

সঞ্জয় বুঝলেন, এতসবের পরও পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাবের কোনো পরিবর্তনই হয়নি। সকলের এত চেষ্টা বৃথাই প্রতিপন্ন হয়েছে। সঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর সমস্ত মন জুড়ে এক বিষাদের ছায়া নেমে এল। সঞ্জয় সহসা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর সুস্থ হয়ে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, যুধিষ্ঠিরের মহাবল ভ্রাতারা, মহাতেজা দ্রুপদ, তাঁর পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কেকয়রাজের পঞ্চপুত্র, বৃষ্ণিবংশীয় মহাবীর সাত্যকি, কাশীরাজ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু, শিশুপাল পুত্র ধৃষ্টকেতু, জরাসন্ধপুত্র সহদেব ও জয়ৎসেন এবং স্বয়ং বাসুদেব— এঁরা সকলেই যুধিষ্ঠিরের সহায়। পাণ্ডবদের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র যেভাবে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবারেও তার ব্যতিক্রম হলো না। সভাসদদের লক্ষ্য করে বললেন, যদি আপনাদের মত হয় তবে আমি শান্তির চেষ্টা করব।

সঞ্জয়ের বোধহয় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। বললেন, মহারাজ, আপনি ধীরবুদ্ধি, অর্জুনের পরাক্রমও জানেন। তথাপি কেন পুত্রদের বশে চলেন জানি না। দ্যূতসভায় পাণ্ডবদের প্রতিবার পরাজয় শুনে আপনি উল্লসিত হয়েছিলেন। তাঁদের যে কটুবাক্য বলা হয়েছিল, তখন তা শুনেও শোনেননি। তাঁরা যখন বনে যান তখন কোনো বিষাদের ছায়া আপনার মুখে দেখা যায়নি। এখন আপনি অসহায়ের মতো বিলাপ করছেন। ভীমার্জুন যাঁর পক্ষে যুদ্ধ করবেন তিনিই পৃথিবীর রাজা হবেন। এখন আপনার দুরাত্মা পুত্র ও তাদের অনুগামীদের সর্ব উপায়ে নিবৃত্ত করুন।

ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রকে অনেক উপদেশ দিলেন। সঞ্জয়ও নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে পাণ্ডবদের জয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু দুর্যোধন নীরব রইলেন। উপস্থিতজনেরা তখন সভাকক্ষ ত্যাগ করে একে একে চলে গেলেন। রইলেন শুধু ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও ব্যাসদেব। এই সভায় যুদ্ধ করা উচিত হবে কিনা তা নিয়ে যখন চর্চা চলছিল তখন অন্যান্যদের মতো কর্ণও কৃষ্ণের মাহাত্ম্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরেই ধৃতরাষ্ট্র বোধহয় সঞ্জয়ের কাছে কৃষ্ণের কথা আর একবার জানতে চাইলেন। বিশেষত সম্প্রতি উপপ্লব্য নগরে গিয়ে কৃষ্ণ কী বলেছেন সঞ্জয় তা শুনে এসেছেন।

সঞ্জয় বললেন, সেই সভায় কৃষ্ণকে সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞ বলে উল্লেখ করে যুধিষ্ঠির তাঁর কথা শুনতে বলেছিলেন। বস্তুত উদ্যোগ পর্বের শেষে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সগুণ ব্রহ্ম বলে আখ্যাত করেছেন— 'কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ'। মহাভারতের উদ্যোগপর্বের ঊনত্রিশটি অধ্যায় জুড়ে থাকা কৃষ্ণের সেই কথা সঞ্জয় মন দিয়ে শুনেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের কথা মতো সঞ্জয় তত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণের সেই কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করলেন।

সেদিন সঞ্জয়কে সম্বোধন করে কৃষ্ণ কর্মের শ্রেয়র কথা বলেছিলেন— কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের বিধান রয়েছে। তাই তাতেও কর্ম আছে। 'সোহয়ং বিধির্বিহিত কর্ম্মণেব সংবর্ত্ততে সঞ্জয়! তত্র কর্ম্ম। (মহা, উদ্, ২৯।৮)। সঞ্জয় বললেন, কৃষ্ণ আমাকেই জিজ্ঞাসা করলেন— ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম যুদ্ধ করা না না-করা? এরপর তিনি চারবর্ণের বিভাগ ও প্রত্যেক বর্ণের পর্যালোচনা করেছেন। শেষে আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে বলে বলেছেন— আমার কথা শুনে তোমার যেমন মনে হয় তেমন ভাবে পাণ্ডবদের কাজের প্রশংসা বা নিন্দা কর। আর মোহাচ্ছন্ন ভীমার্জুনকে তিরস্কার করে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছেন। সেই তিরস্কারের ভাষা অতি তীক্ষ্ণ— 'ক্লীব ইবাত্মানি' (পুরুষত্বহীন), 'কশ্মলেনাভিপন্নোহসি (বিকারগ্রস্ত)।

উপপ্লব্য নগরে কৃষ্ণ যেসব কথা তাঁকে বলেছেন, ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় তারই যথাযথ বর্ণনা করেছেন সঞ্জয়। লক্ষণীয় হলো, সেখানে স্বয়ং ব্যাসদেবও উপস্থিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে কৃষ্ণ অর্জুনকে গীতামুখে যা বলবেন সঞ্জয়কে কি তারই পূর্বাভাষ দিয়ে রাখলেন? নিষ্কাম কর্মযোগ, চতুর্বর্ণ, ভীমার্জুনকে তিরস্কারের মাধ্যমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার প্রয়াস— 'উত্তিষ্ঠ স্ব বিষাদং মা কথা বীর!' (উদ্, ৭০।২২)। সূক্ষ্ম বৈদান্তিক তত্ত্বের ধারণ করার মতো যোগ্য আধার হিসেবে তিনি কি অর্জুনের বাল্যবন্ধু সঞ্জয়কেও মনে করতেন? সঞ্জয় যে ভাগবত ধর্ম বহনের যোগ্য অধিকারী, মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই নির্বাচন যে অত্যন্ত সঠিক ছিল, মহাভারতে ভীষ্মপর্বেই অবশ্য তার প্রমাণ রয়েছে। স্বয়ং ব্যাসদেবই সঞ্জয়ের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন— সঞ্জয় দিব্যজ্ঞানী, দূরশ্রবা, অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা, ত্রিকালদ্রষ্টা, পরচিত্তবেত্তা, আকাশচারী, শস্ত্রঘাত-সংহারী শক্তির অধিকারী—

'দৃষ্টিশ্চাতীন্দ্রিয়া রাজন! দূরাচ্ছ্রবণমেব চ।
পরিচিত্তস্য বিজ্ঞানমতীতানাগদতস্য চ।।
ব্যুথিতোৎ পত্তিবিজ্ঞান-মাকাশে চ গতিঃ শুভা।
অস্ত্রৈরসঙ্গো যুদ্ধেষু বরাদনন্মহাত্মনঃ।। (মহা, ভী, ১৫।৮-৯)

সঞ্জয় ও কৃষ্ণ— দুইজনেরই দৌত্য ব্যর্থ হওয়ায় যুদ্ধ নিশ্চিত। ধৃতরাষ্ট্র শোকার্ত হয়ে দুর্বিনীত পুত্রদের কথা ভাবছিলেন। আসন্ন যুদ্ধের পরিণতির কথা ভেবে তাঁর পিতৃহৃদয় হাহাকার করে উঠছিল। এমন সময় মহর্ষি ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন— রাজা, শোক করো না। কালের গতিতে এমন হবে জেনেই তুমি শোক দূর কর। পুত্র, যদি তুমি যুদ্ধ দেখতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে আমি দিব্যদৃষ্টি দেব— 'চক্ষুর্দদানি তে পুত্র।' (মহা, ভীষ্ম, ২।৬)। ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞাতিবধ দর্শনের অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিবরণ শুনতে ইচ্ছা করলেন। তখন ব্যাসদেব বললেন, গবলগনপুত্র এই সঞ্জয়কে বর দিচ্ছি, 'সঞ্জয়ায় বরং দদৌ;' সঞ্জয় আমার বরে দিব্যচক্ষু লাভ করবেন— (ভীষ্ম, ২৮)। যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা এঁর প্রত্যক্ষ হবে, ইনি সর্বজ্ঞ হয়ে তোমাকে যুদ্ধের বিবরণ বলবেন— 'চক্ষুষা সঞ্জয়ো রাজন্! দিব্যেনৈষ সমন্বিতঃ। কথায়ষ্যতি তে যুদ্ধং সর্বজ্ঞশ্চ ভবিষ্যতি।' ব্যাসদেব এখানেই থামলেন না। তারপরও তিনি বললেন— প্রকাশই হোক বা অপ্রকাশই হোক, কিংবা দিনেই হোক বা রাত্রেই হোক, এমনকী অন্যে মনে মনেও যা চিন্তা করবে, সে সমস্তও সঞ্জয় জানতে পারবেন। কোনো অস্ত্র তাঁকে বিদীর্ণ করতে পারবে না। কিংবা পরিশ্রম ক্লান্ত করতে পারবে না, সঞ্জয় জীবিত থেকেই এ যুদ্ধ থেকে মুক্তি পাবেন—

প্রকাশং বা বাহপ্রকাশং বা দিবা বা যদি বা নিশি।
মনসা চিন্তিতমপি সর্ব্বং ব্যেস্যতি সঞ্জয়ঃ।।
মৈনং শস্ত্রানি ভেৎস্যন্তি নৈনং বাধিষ্যতে শ্রমঃ।
গাবল্গনিরয়ং জীবন্ যুদ্ধাদস্মাদ্বিমোক্ষ্যত্যে।।
(ভীষ্ম, ২।৯-১২)

লক্ষণীয় বিষয় হলো, ব্যাসদেব সঞ্জয়কে শুধু দিব্যচক্ষু দিয়ে সন্তুষ্ট হননি, সেইসঙ্গে বিশেষ বিশেষ কাজ করার জন্য আরও বরদান করেছেন। শুধু 'ওয়ার রিপোর্টিং' বা 'রিলে' অর্থাৎ ধারাভাষ্য দেওয়ার জন্য এতসবের প্রয়োজন হয় কি? সত্য বটে, এর আগে এভাবে যুদ্ধ-সাংবাদিকতা বা ধারাভাষ্যের নজির বিশ্ব ইতিহাসে কোথাও নেই। এইদিক থেকে সঞ্জয়কে আদি যুদ্ধ-সাংবাদিক বা ধারাভাষ্যকার মানতেই হয়। কিন্তু এজন্য এত কিছু?

বংশ পরিচয়ে বা কর্মের দিক থেকেও সঞ্জয়ের পরিচয় কোনো অভিজাত শ্রেণীর নয়। কৌরব রাজসভায় ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর বা কৃপাচার্যের যা স্থান, তার কাছাকাছিও তিনি নন। তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ব্যক্তিগত সচিব মাত্র। অথচ দেখছি, এমন দুই ব্যক্তি— মহাত্মা কৃষ্ণ ও মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁকে যা বলছেন বা দিয়েছেন, এমন দৈবী সম্পদ লাভের যোগ্যতা কজনেরই বা হয়? আসলে সঞ্জয়ের অন্তরে ছিল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই জ্ঞান লাভের চাবিকাঠি। 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্।' মহর্ষির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার— আস্থা ও বিশ্বাসের কারণেই সঞ্জয় যে দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রও তা বুঝেছিলেন। বলেছেন, 'দিব্যবুদ্ধি প্রদীপেন যুত্তস্ত্বং জ্ঞানচক্ষুষা' (ভীষ্ম, ৪।৮)। সঞ্জয় জ্ঞানী, অধীত বিদ্যার অধিকারী। সূতপুত্র হওয়ার কারণে ভারতবর্ষের প্রাচীন থেকে বর্তমান সকল বিষয়ই তাকে অধিগত রাখতে হয়েছে। ব্যাসদেবের পরেই মহাভারতকথক হিসেবে যিনি চিহ্নিত তিনি সঞ্জয়। ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয়-বয়স্য, মন্ত্রী তথা সচিব সঞ্জয় বীর, কর্মী, সংহত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সঞ্জয় স্বধর্মে থেকে সেই স্বকর্মই নিষ্ঠা সহকারে পালন করে চলেছেন। শুধু কর্ম অথবা শুধু জ্ঞান যে মুক্তি এনে দিতে পারে না, জ্ঞানযুক্ত হয়ে কর্ম করাই যে শ্রেয় সঞ্জয় যে এই ভাব-ভাবনার অন্যতম প্রতিভূ হয়ে উঠতে পারেন, ত্রিকালজ্ঞ ব্যাসদেব তা বুঝেছিলেন। তাই সঞ্জয়কে বেছে নিয়েছেন, যোগ্য হিসাবে তৈরি করে নিতে উন্মীলন ঘটিয়েছেন তাঁর জ্ঞানচক্ষুর।

বাইরের দৃষ্টিতে অন্ধ হলেও ধৃতরাষ্ট্র অন্তর্দৃষ্টিতে জাগ্রত, শ্রুত-প্রাজ্ঞ। তাঁর উপলব্ধিতে কৃষ্ণ হলেন ঋষি, মহাজ্ঞানী, মহাবাগ্মী, জিতেন্দ্রিয়গণের অনায়াসলভ্য, সহস্রশীর্ষ প্রাচীন পুরুষ— 'ঋষিং সনাতনতমং বিপশ্চিতং বাচঃ সমুদ্রং কলসং যতীনাম্/ ... সহস্রীশীর্ষং পুরুষং' (উদ্, ৬৬।৬৬-৬৭)। তিনি তাঁর উপলব্ধিটিকে এই প্রিয় বয়স্য সচিবটির কাছ থেকে যাচিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। সেই সূত্রেই বাসুদেব কৃষ্ণর প্রতি সঞ্জয়ের যে কী গভীর শ্রদ্ধা তা অনুভব করি। সঞ্জয় বলেছেন— জগতের সবই

With the best Compliments from :

Phone : 2237-5919
2237-2090
2237-2822
Fax : 2237-0269
E-mail : kolkata@allindatpt.com
Web-site : www.allindiatpt.com

ALL INDIA ROAD TRANSPORT AGENCY
AIRTA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
ALL INDIA PACKERS & MOVERS

H.O. : 28, BLACK BURN LANE,
KOLKATA-700 012

Time Guaranteed delivery. Transporters for all over India, Marine type ISO Container trucks available. Bank-approved specialists in ODC Cargoes by heavy duty Trucks & Trailers. Specialists in packing of household goods & Transpotation. Branches & Association all over India.

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

—ঃ সৌজন্যে ঃ—

মনমোহন চৌধুরী

তাঁকে আশ্রয় করে থাকে বলে তিনি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'বসু', দেবগণের কারণ বলে 'দেব'। তাই তাঁর এক নাম বাসুদেব। তিনি সর্বব্যাপক বলে 'বিষ্ণু' — 'বৃহত্ত্বাদ্বিষ্ণুরুচ্যতে' (উদ্, ৬৬।৪৯)। অবিদ্যা অসুর জয় করেন বলে 'জিষ্ণু'— 'জয়নাজ্জিষ্ণুরুচ্যতে।' মায়া বা অবিদ্যাকে দূর করেন বলে মাধব, সত্তা ও আনন্দ— উভয়েরই প্রকাশক, তাই তিনি কৃষ্ণ।

নরের আশ্রয়স্থল, তাই তিনি নারায়ণ। তিনি 'পুরুষোত্তম'। কৃষ্ণে সত্য প্রতিষ্ঠিত, সত্যও তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত— তাই তিনি 'সত্য'। 'সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্রপ্রতিষ্ঠিতম্' (উদ্, ৫৯)। সঞ্জয়ের অন্তর্লোকে কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধার যে ব্যাপ্তি, তা দেখলাম। সূত বংশপরম্পরায় প্রচলিত যে বিশ্বাস, তার উত্তরসূরীও তিনি। বংশপরম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত বিশ্বাস শুধু নয়, তাঁর মনের গড়নে যুগপরিবেশের প্রভাবটিও লক্ষণীয়।

শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে সময় বৈদিক ধর্মের যে কর্মকাণ্ড, সেটিরই ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই কর্মকাণ্ডকেই বলা হতো ধর্ম। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন, তাঁর বংশের জনমেজয় সর্পসত্র যজ্ঞ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এই কামনামূলক যাগযজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম করতে বলেছেন, ঈশ্বরভক্তির কথা বলেছেন। এইসব কারণে তাঁর প্রচারিত এই সমন্বয় ধর্মকে বৈদিক ধর্ম থেকে আলাদা বলে মনে কর হতো। বলা হতো— ভাগবত ধর্ম। সঞ্জয় এই ভাগবত ধর্মের যোগ্য কথক হতে পারেন বুঝে বাসুদেব কৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরে বিরাট রাজসভায় নিষ্কাম কর্মের এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের কথা তাঁকে বলেছিলেন।

সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দান করে ব্যাসদেব চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, রাজারা ভূমির জন্যই যুদ্ধ করেন, কেননা ভূমির বহু গুণ আছে। তুমি আমাকে তা বল। যা তাঁর জানা আছে তাই তিনি বলছেন বলে সঞ্জয় জীব ও ভূবৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। বললেন, স্থাবর, জঙ্গম-সহ পাহাড় মহাভূত বা জীবের বৃত্তান্ত। সমস্তই ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূমিতেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ভূমিই সর্বভূতের পরম আশ্রয়। যার ভূমি আছে সে স্থাবর জঙ্গমের অধিকারী। এই কারণেই রাজারা ভূমির লোভে পরস্পরকে হত্যা করে। দূরদর্শী সঞ্জয়ের এই কথা আজও কি সত্য নয়? 'রিয়েলিটি স্টেট', 'সিন্ডিকেট রাজ' শব্দগুলি কি সঞ্জয়ের কথারই প্রতিধ্বনি করে না?

এরপর ভূবৃত্তান্তের বর্ণনা প্রসঙ্গে সঞ্জয় ভারতবর্ষের নদনদী, পাহাড়-পর্বত, গ্রাম ও জনপদগুলির কথা বললেন। বিশাল ও বৈচিত্রপূর্ণ এই ভারতবর্ষই আমাদের মাতৃভূমি, এখান থেকেই সর্বপ্রকার পুণ্যকর্মও প্রবর্তিত হয়েছে। ভীষ্মপর্বের নবম অধ্যায় জুড়ে রয়েছে কথক সঞ্জয়ের এই ভারত দর্শন যা আমাদের আবেগকে স্বদেশকে মাতৃজ্ঞানে দেখায় উদ্বুদ্ধ করে। মাতা-পুত্রের এই আবেগজাত সম্পর্কই আজকের ভাষায় জাতীয়তা। সেদিক থেকে সঞ্জয়কে 'জাতীয়ভাব'-এর এক দ্রষ্টা বলাই যেতে পারে।

কুরুক্ষেত্রে ষষ্ঠদিনের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে বিরাটরাজের দুই পুত্র উত্তর ও শ্বেত, ভূরিশ্রবার তীক্ষ্ণ ভল্লের আঘাতে সাত্যকির দশ পুত্র-সহ দুই পক্ষেরই বহু সেনা নিহত হয়েছে। সঞ্জয়ের কাছে যুদ্ধের বিবরণ শুনতে শুনতে ধৃতরাষ্ট্র নিজ সৈন্যদের প্রশস্তি ও দৈবের প্রতি দোষারোপ করতে লাগলেন। বললেন, সঞ্জয়, এই যুদ্ধ এইরকমই চলতে থাকবে। কেননা, বিধাতা যা ঠিক করে রেখেছেন তাই-ই হবে।

প্রত্যুত্তরে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আপনার দোষেই দ্যূতক্রীড়া হয়েছিল, তার ফল এই যুদ্ধ। আপনি এখন নিজ কর্মফল ভোগ করছেন— 'আত্মনা হি কৃতং কর্ম্ম আত্মনৈবোপভুজ্যতে।' (ভীষ্ম, ৭৪।৬৭)

দশম দিনের যুদ্ধে সূর্যাস্তের সামান্য আগে অর্জুনের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভীষ্ম রথ থেকে পড়ে গেলেন। কিন্তু শরে আবৃত থাকায় তিনি ভূমি স্পর্শ করলেন না। তাঁর মৃত্যুও হলো না। কেননা, পিতা শান্তনুর বরে মৃত্যু তাঁর ইচ্ছাধীন। সূর্যের উত্তরায়ণে দেহত্যাগের ইচ্ছায় মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রইলেন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, ভরতবংশীগণের পিতামহ ভীষ্ম নিহত হয়েছেন— 'আবষ্ট নিহতম্ ভীষ্মম্ ভরতানাম্ পিতামহম্।' (ভীষ্মপর্ব)। সঞ্জয় পূর্বাহ্ণেই আশংকা করেছিলেন যুদ্ধের দশমদিনে নক্ষত্র পতন ঘটবে। ঘটলও তাই। রাজারা অস্ত্র ত্যাগ করে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন। ইহলোকে কে এমন আছেন যিনি তাঁকে শ্রদ্ধা না করে থাকতে পারেন? সঞ্জয়ের কাছে ভীষ্ম ছিলেন শৌর্যে ইন্দ্রতুল্য, স্থৈর্যে হিমালয়সদৃশ, গাম্ভীর্যে সমুদ্র সমান এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর ন্যায়— 'মহেন্দ্রসদৃশঃ শৌর্য্যে স্থৈর্য্যে চ হিমাবানিব।...' (ভীষ্ম, ১৩।৮)

যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অভিমন্যু নিহত হলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে অভিমন্যুবধের বৃত্তান্ত শুনিয়ে সঞ্জয় বললেন— মহারাজ, দ্রোণ, কর্ণ প্রমুখ ছয়জন মহারথী অভিমন্যুকে বেষ্টন করে বধ করলেন। এইভাবে বধ করাকে ধর্মসঙ্গত মনে করি না। ধর্মনিষ্ঠ সঞ্জয় আক্ষেপ করেছেন বটে, কিন্তু এই যুদ্ধে অনেক ধর্মবিরুদ্ধ কাজ হয়েছে। স্বয়ং কৃষ্ণই নিজের প্রতিজ্ঞা ভুলে অস্ত্রধারণ করেছেন। সে কথা থাক। এরপর একটা একটা করে চারটে দিন পার হয়ে গেছে। উভয় পক্ষের রথী-মহারথীরা, যেমন ভগদত্ত, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, ঘটোৎকচ, রাজা দ্রুপদ ও বিরাট, দ্রোণাচার্য, দুঃশাসন, মহাবীর কর্ণ রণভূমিতে শয্যা নিয়েছেন। অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এইদিন মধ্যাহ্নকালে যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যকে ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভল্লের আঘাতে শ্বালকে বধ করেছেন।

ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় দিব্যচক্ষু লাভ করে যুদ্ধক্ষেত্রে

উপস্থিত থাকতেন এবং প্রতিদিন যুদ্ধশেষে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধাবৃত্তান্ত জানাতেন। মহারথ শল্যের নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, সঞ্জয়, তোমরা একসঙ্গে ছিলে, তবুও তোমাদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধে পাণ্ডবরা কী করে শল্যকে ও আমার পুত্রদের বধ করল?

কথঞ্চ বঃ সমেতানাং মদ্ররাজ্যে মহারথঃ।

নিহতঃ পাণ্ডবৈঃ সংখ্যে পুত্রে বা মম সঞ্জয়! (শল্য, ২।৬৫)

সঞ্জয় তাঁর আশংকাকে প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করতে যেতেন। ভারতবর্ষের প্রায় সকল নৃপতিই এই মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যক্ষ করাও ছিল তাঁর রণভূমিতে যাওয়ার কারণ। দ্রোণপর্বের সূচনাতেই দেখি— রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন ভীষ্ম নিহত হওয়ার দুঃখে বিষণ্ণ, চিন্তিত, তখন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিতে আবার ফিরে এসেছেন—'আজগাম বিশুদ্ধাত্মা পুনর্গালবল্‌গণিস্তদা' (দ্রোণ, ১।৬)। তিনি প্রতিদিনই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতেন। সেদিন ফিরেছেন রাত্রিতে। কুরুক্ষেত্রের শিবির থেকে হস্তিনাপুরে— 'শিবিরাৎ সঞ্জয়ং প্রাপ্তং নিশি নাগহয়ং পুরম্' (দ্রোণ, ১।৭)। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি স্থির হয়ে শুনতে বলেছেন— শুনুন, যেভাবে যুদ্ধ হয়েছিল আমি সেইভাবেই বলছি—'শৃণু যুদ্ধং যথাবৃত্তং শংসতো মে নরাধিপ' (ভীষ্ম)।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে সঞ্জয় যে শুধু দর্শকই ছিলেন এমন নয়। তিনি নিজেও যুদ্ধে এক-আধবার অস্ত্র ধরেছেন। সঞ্জয় দেখলেন দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহিনী কৌরব সেনাদের ঘিরে ফেলেছে, সেনাদের সংখ্যাও কম। তখন তিনি ও অন্য চারজন যোদ্ধা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সঞ্জয় যে এরকম এই প্রথম ঝাঁপালেন এমন নয়, মহাধনুর্ধর চেকিতানকে প্রতিরোধেও অস্ত্র ধরেছিলেন— 'চতুঃশতৈর্মহেস্বাসৈশ্চেকিতা নমবারয়ম্' (দ্রোণ, ৮২।৪১)। ব্যাসদেবের বরে 'দিব্যচক্ষু' লাভ করে তিনি শুধুই দর্শকের ভূমিকা পালন করতেন এমন নয়। বিশেষত, চেকিতানকে রুখতে যে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন তা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। বৃষ্ণিবংশীয় যাদববীর সাত্যকির আঘাতে তাঁর বর্ম বিদীর্ণ হলো, তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। সাত্যকির হাতে বন্দি হলেন।

সঞ্জয়কে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহাস্যে সাত্যকিকে বললেন, একে বাঁচিয়ে রেখে কী লাভ? বন্দি করা কেন? সাত্যকি তখন খড়্গ তুলে সঞ্জয়কে বধ করতে উদ্যত হলেন। সঞ্জয়ের ভাগ্য ভাল, ঠিক সেইসময় সেখান ব্যাসদেব উপস্থিত হয়েছিলেন। বললেন, সাত্যকি, তুমি সঞ্জয়কে মুক্তি দাও, একে বধ করা উচিত হবে না। সাত্যকি মহর্ষিকে প্রণাম করে ব্যাসদেবের আদেশ মেনে নিয়ে বললেন, সঞ্জয় যাও, তোমার মঙ্গল হোক।

তখন অপরাহ্ণ। ব্যাসদেবের কৃপায় মুক্তি লাভ করেছেন সঞ্জয়। 'ন্যস্তবর্ম্মা নিরায়ুধ'— নিরস্ত্র ও বর্মহীন হয়ে 'রুধিরোক্ষিত' দেহে হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন। সঞ্জয় প্রতিদিনই সায়াহ্নে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবিরতির পর শিবিরে যেতেন। শিবিরের সংবাদ সংগ্রহ করতেন। তারপর সারা দিনের ঘটনাগুলি হস্তিনায় ফিরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে জানাতেন। এদিনও ফিরলেন তবে রক্তাক্ত দেহে।

এক ক্রোশ দূরে গিয়ে সঞ্জয় দেখলেন, দুর্যোধন ক্ষতবিক্ষত দেহে গদাহস্তে একাকী এক বৃক্ষের নীচে অবস্থান করছেন। এ কী অবস্থা হয়েছে রাজা দুর্যোধনের! সঞ্জয়ের চোখে জল এসে গেল। চোখে জল দুর্যোধনেরও। কিছুক্ষণ দুজনে দুজনের দিকে কাতরভাবে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর দুর্যোধন একটু প্রকৃতিস্থ হলে সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রে সাত্যকির হাতে তাঁর বন্দি হওয়ার কথা, ব্যাসদেবের আকস্মিক আগমনে তাঁর মুক্তি হওয়ার কথা জানালেন। সেইসঙ্গে আরও বললেন, তার সকল ভ্রাতাই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। কৌরবপক্ষের কেবল তিনজন রথী— কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা জীবিত আছেন। সঞ্জয়ের কথা শুনে দুর্যোধন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, সঞ্জয়, তুমি প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে জানিও, তাঁর পুত্র দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় নিয়েছে। এই অবস্থায় কেই বা বেঁচে থাকতে চায়? এই কথা বলে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আর তার একটু পরেই সেখানে কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা উপস্থিত হলেন। সঞ্জয় সকল সংবাদ তাদেরও জানালেন।

পরদিন শ্রান্ত, বিষণ্ণ, শোকার্ত সঞ্জয় হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। কাঁপতে কাঁপতে ধৃতরাষ্ট্র ভবনে গিয়ে শোকার্ত সঞ্জয় 'হে রাজা' বলে কাঁদতে লাগলেন— 'রুরোদ স নরব্যাঘ্র' (শল্য ১।১৬)। হস্তিনাপুরবাসীরাও সঞ্জয়কে কাঁদতে দেখে উদ্বেগে অস্থির হয়ে 'হা রাজা' বলে কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্যোধনের লুকানোর আগে তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন — 'তস্মৈ তদহমাচক্ষং সর্ব্বং প্রত্যক্ষ দর্শিবান্' (শল্য, ২৭।৪৫)— তার সবই বললেন। একথাও জানালেন, দুর্যোধনকেও তিনি এই বৃত্তান্ত জানিয়েছেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ। শত পুত্রের মৃত্যুতে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত শোকাকুল। সঞ্জয় তাঁকে বললেন, মহারাজ, শোক করছেন কেন, শোকের কোনো প্রতিকার নেই। এখন আপনি মৃত আত্মীয় সুহৃদগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করুন। সেইমতো অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হলে মৃতজনের তর্পণের পর পাণ্ডবগণ অশৌচ পালনের জন্য একমাস গঙ্গাতীরেই বাস করলেন। যুদ্ধজয়ের পর পাণ্ডবরা ছত্রিশ বছর রাজ্যপালন করেছিলেন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছেই থাকতেন। এভাবে পনের বছর অতীত হলে ধৃতরাষ্ট্র বনগমনের সংকল্প করলেন। বিদুর এবং সঞ্জয়ও একই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁরাও বনবাসী হলেন। তাঁদের সঙ্গে গান্ধারী ও কুন্তীও। এরপর কয়েক বৎসর গত হয়েছে। এমন এক সময়ে দেবর্ষি

নারদ হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। দেবর্ষির কাছ থেকেই ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর দাবানলে প্রাণত্যাগের কথা পাণ্ডবেরা জানতে পারলেন। দেবর্ষি বলেছিলেন, সঞ্জয় তাঁদের এই বৃথাগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ করতে নিষেধ করলেও ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী সেই নিষেধ শোনেননি। আপন সংকল্পে তাঁরা অটুট ছিলেন। দাবানলেই তাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। আত্মরক্ষার জন্য সঞ্জয়কে সেখান থেকে চলে যেতেও বলেছিলেন। যেখানে আগুন নেই সেখানে যাও— 'গচ্ছ সঞ্জয় যত্রাগ্নি র্ন ত্বাং দহতি কর্হিচিৎ'। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ফেলে যেতে চাননি। কিন্তু দাবানলের এই বিপাক থেকে তাঁকে বাঁচতেই হবে। কেননা, এই দাবানল বৃথাগ্নি। নিশ্চেষ্ট থেকে এই অগ্নিতে মৃত্যুর অর্থ আত্মহত্যা। আত্মহত্যা মহাপাপ।

সঞ্জয় তাই দ্রুত বিপদসীমার বাইরে চলে যেতে চাইলেন। গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) পৌঁছে সেখানে তপস্যারত মহর্ষিদের এই সংবাদ জানালেন। এরপর আত্মবোধে সঞ্জীবিত সঞ্জয় হিমালয়ের উদ্দেশে মহাপ্রস্থানের পথে রওনা হলেন।

এ প্রসঙ্গে স্মরণে থাকতে পারে, পিতামহ ভীষ্ম নিহত হওয়ার সংবাদ সঞ্জয়ই ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়েছেন। বিচলিত ও ব্যাকুল ধৃতরাষ্ট্র এই অভাবিত দুঃসংবাদ যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বারবার তাঁর জিজ্ঞাসা— তাঁর ও পাণ্ডুপুত্ররা কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়ে কী করছিল— 'কিমকুর্বত সঞ্জয়'। ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসার জবাবে সঞ্জয় আনুপূর্বিক যুদ্ধের বর্ণনা করেছেন। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ২৫ থেকে ৪২ পর্যন্ত আঠারোটি অধ্যায়ে সঞ্জয়ের সেই বর্ণনাই গীতা নামে প্রসিদ্ধ। বর্তমানে প্রচলিত গীতা সংস্করণে ভগবান আদি শঙ্করাচার্য নির্দিষ্ট ৬৯৯টি শ্লোক আছে যার মধ্যে সঞ্জয় উবাচ ৪০.৫টি। ধৃতরাষ্ট্রের মাত্র ১০টি। আর বাকি সবগুলিই শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ। এই সংবাদেরই অবিকৃতভাবে বিবরণ দিয়েছেন সঞ্জয়। ব্যাসদেবের কৃপায় দিব্যদৃষ্টির অধিকারী সঞ্জয় শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন। বিস্মিত, পুলকিত আনন্দিত সঞ্জয় বলেছেন— এই পরম গুহ্য যোগ স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে শুনেছি— 'শ্রুতবানেতদ্' (১৮।৭৫)। হে রাজা, শ্রীকৃষ্ণার্জুনের পুণ্য অদ্ভুত বিশ্বরূপ দর্শন ও কথোপকথন স্মরণ করে বারবার রোমাঞ্চিত হচ্ছি। বিস্মিত হচ্ছি এক অলৌকিক আনন্দ অনুভব করছি। সহস্র সূর্য জ্যোতিতে বিমূঢ় না হয়ে সঞ্জয় অপার আনন্দ ও বিপুল সাহসের সঙ্গে বিশ্বরূপের ছবি এঁকেছেন। যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা একই সঙ্গে উদিত হয়, তবে সেই দীপ্তি বিশ্বরূপের প্রভার সঙ্গে সামান্য তুলনা হতে পারে— 'দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা / যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ' (গীতা, ১১।১২)।

বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুন যেমন 'হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ', তাঁর মোহ নষ্ট হয়েছে, তিনি এখন নিঃসংশয়। শ্রীভগবানের উপদেশ পালনে সংকল্পবদ্ধ— 'করিষ্যে বচনং তব' (গীতা, ১৮।৭৩)। সঞ্জয়ও এর ব্যতিক্রম নন। অর্জুনের মতোই তাঁর বিস্ময়, শিহরণ ও সুগভীর পুলকানুভূতি। পিতামহ ভীষ্মের মতোই সঞ্জয়েরও বিশ্বাস— শ্রীকৃষ্ণ 'মহাযোগেশ্বরো হরিঃ' (গীতা, ১১।৯), এক মহাত্মা— 'স্যাদ্ভাস্তস্য মহাত্মনঃ' (গীতা, ১১।১২)। বিশ্বরূপ দর্শনে এক দিব্য চেতনায় সঞ্জয়ের উত্তরণ ঘটেছে। সংযতচিত্ত সঞ্জয় তাঁর উপলব্ধিজাত সত্যকে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন— যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন, যেখানে ধনুর্ধারী অর্জুন আছেন, সেখানে শ্রী, বিজয়, সামগ্রিক অভ্যুদয় ও সনাতন-ধর্মনীতি বিরাজ করছে বলে আমার স্থির বিশ্বাস—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।। (গীতা, ১৮।৭৮)

যোগেশ্বর ও ধনুর্ধর— এই দুয়ের মিলনের অর্থই হলো জ্ঞান ও কর্মের, ত্যাগ ও ভোগের, ব্রাহ্মণশক্তি ও ক্ষাত্রবীর্যের, আত্মমুক্তি ও জগৎকল্যাণের এক মহাসমন্বয়। মননে সমৃদ্ধ, প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত সঞ্জয়ের এই অন্তিম বাণী সাফল্য, ঐশ্বর্য, সিদ্ধি ও সমৃদ্ধির দিশারি। সঞ্জয়ের এই ধারাভাষ্য যুগ যুগ ধরে বিশ্ববাসীর চলার পথকে সঞ্জীবিত করে চলেছে। ধন্য সঞ্জয়, প্রণম্য সঞ্জয়।

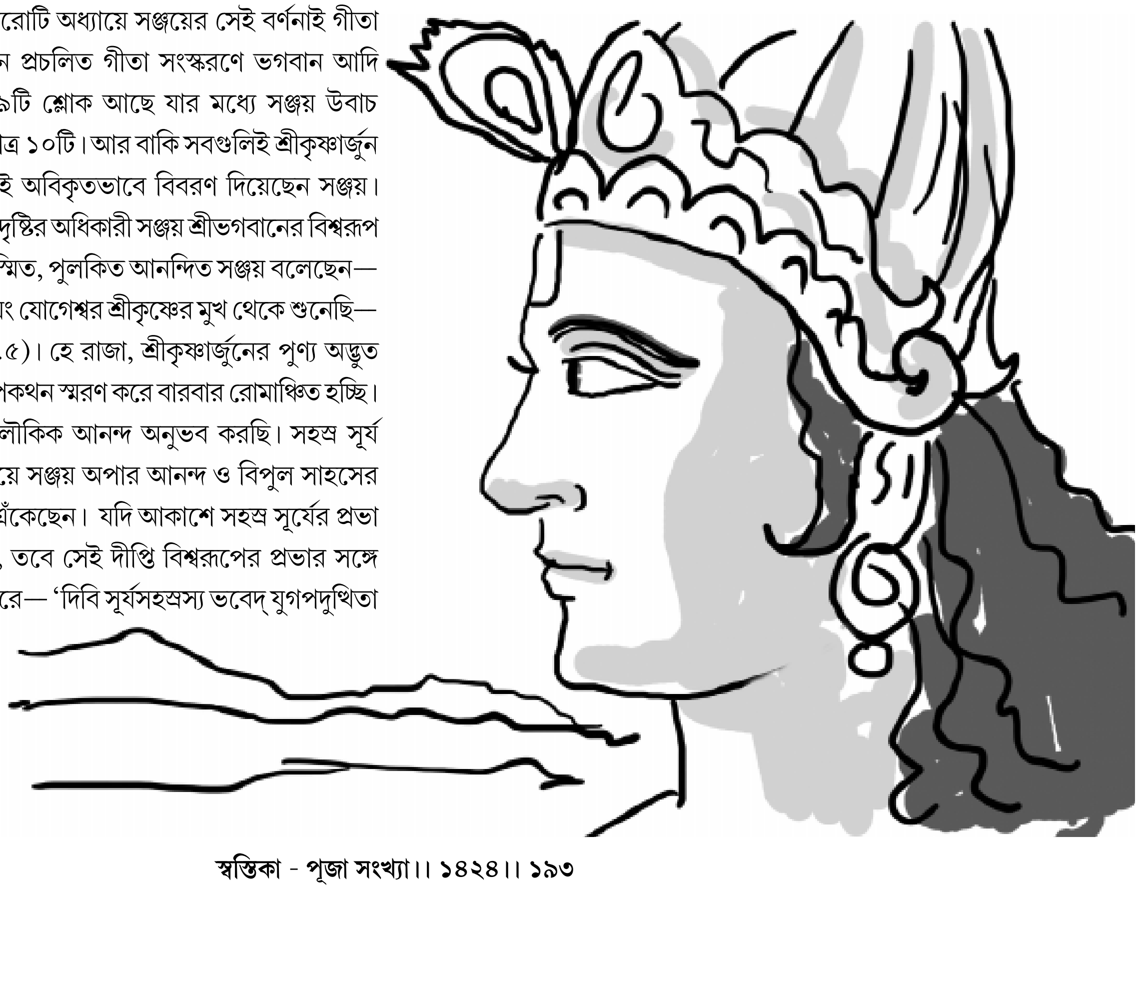

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

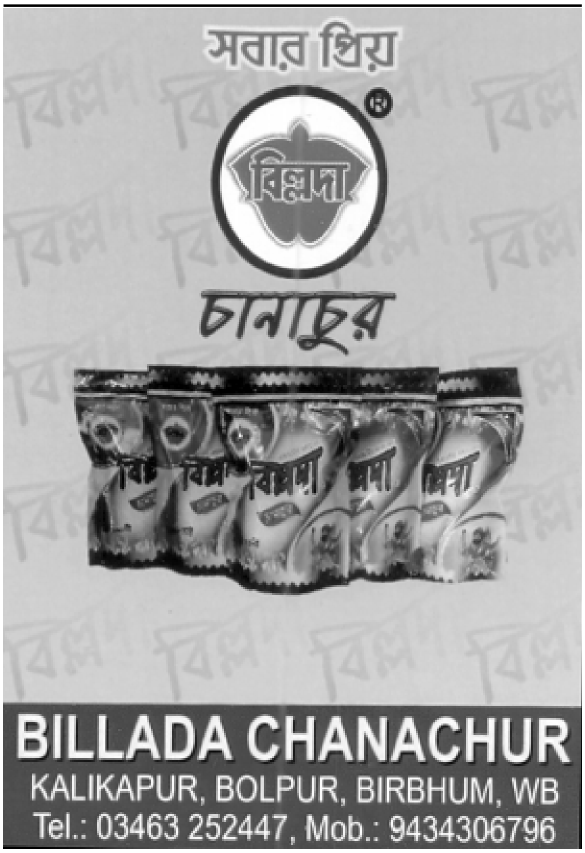

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬